# শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা

রফীক আহমদ

# শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা

গোয়েন্দা সিরিজ—১

# শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা

রফীক আহমদ

মাকতাবাতুল কুরআন

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৮৭৬২৮৬৭৮

## অর্পণ

.............................................

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা
**সিরাজুল হক** সাহেবের রুহের
মাগফিরাত কামনায়—

**রফীক আহমদ**

হিংস্র শ্বাপদের আস্তানায়

ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে ফাটল

যশোবন্তের গ্রেফতারী

# দুটি কথা

গোয়েন্দা শব্দ শ্রবণান্তেই মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠে লোমহর্ষক নির্যাতন ও অক্লান্ত পরিশ্রমের করুণ চিত্র। সমূহ আশংকায় আঁৎকে উঠে মন, শিহরিত হয়ে যায় গা, বন্ধ হয়ে যায় রা, স্তব্ধ হয়ে যায় হৃদয়ের স্পন্দন। এত কিছু সত্ত্বেও এ গোয়েন্দা বিভাগ থেমে নেই। সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে, নির্যাতন, নিপীড়নের কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে রহস্য উদঘাটনের অদম্য নেশায় উল্কার গতিতে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলছে, তাদের এ ঐকান্তিক পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ দেখে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবিতা মনে পড়ে গেল।

কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে।
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।

পৃথিবীর উষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সকলের কাছে গোয়েন্দার গুরুত্ব অপরিসীম। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে দেশের গোয়েন্দা বিভাগ যত মজবুত সে দেশ ততবেশি শক্তিশালী। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যেই 'শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা'র অবতারণা। মূলত শত্রুদেশে মুসলিম গোয়েন্দা হচ্ছে, মুসলিম ভূখণ্ড ও নিজ মাতৃভূমিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে। ঈমানের আলোকে ঝলসে ওঠা এক উদীয়মান আত্মত্যাগী তরুণের আত্মজীবনী। এতে কোন প্রকার বানোয়াট বা কাল্পনিক ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়নি। শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরে দু' এক স্থানে জায়গার নাম ও ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া বাকী কাহিনী অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। আশা করি এ জীবনী মুসলিম যুব সমাজের আত্মার খোরাক যুগাবে। প্রজ্জ্বলিত করবে চেতনার মশাল। জাগ্রত করবে হতাশার ভারে নুয়ে পড়া মুসলিম শার্দুলকে, যারাই ইসলামের হেলালী নিশানকে পত পত করে উড়াবে বিশ্বময়।

এ বই প্রকাশে অনেকেরই অবদান রয়েছে। বিশেষ করে বন্ধুবর মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, স্নেহের ইবরাহীম খলীল ও আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। তাদের সহযোগিতা না পেলে এ বই প্রকাশ করা হতো না। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং পাঠক মহলকেও উপকৃত করুন। আমীন!

লেখাকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি। তদুপরি ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কেউ ত্রুটি-বিচ্যুতি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।


**রফীক আহমদ**

উত্তরা মডেল টাউন

ঢাকা-১২৩০।

# হিংস্র শ্বাপদের আস্তানায়

রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্সের বিমান কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্টে ঠিক চারটায় রানওয়ের দিকে যেতে শুরু করেছে। আমি জানালার পাশের সিটে বসে আছি। এহেন মুহূর্তে আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে। আমার দৃষ্টি এয়ারপোর্টের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আটকে আছে। প্রতিনিয়তই স্মৃতির ক্যানভাসে এ ভয়ই ভেসে উঠছে যে, এখন পুলিশের গাড়ি দেখা যাবে আর পাইলট বিমানকে টেক্সিওয়ের উপরই থামিয়ে দিবে এবং পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে ফেলবে। যদিও এমন ঝড় পূর্বেও কয়েকবার আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তথাপি একাধারে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত জীবন-মরণের খেলা খেলার পর আমি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছি। তদুপরি পরিস্থিতি তো এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, একদিকে স্বাধীনতা, নিজের মাতৃভূমি, নিজের ঘর, নিজের পরিবার অপরদিকে থার্ড ডিগ্রী নির্যাতনের পীড়াদায়ক মৃত্যু। এ দুয়ের মাঝে শুধু কয়েক মিনিটের ব্যবধান, আর কয়েক মিনিটেই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে পারে। তাছাড়া সব সময় তো সুযোগ হাতে আসে না। এখন তো এটা সর্বশেষ লড়াই। যদি খেলার মোড় ঘুরে যায়– তা কল্পনা করা মাত্রই গা শিহরিত হয়ে উঠল। গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল, ভয়ের তরঙ্গমালা আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। যার ফলে আমি চোখ দুটি বন্ধ করে ফেললাম এবং ভাল-মন্দ সবকিছুই সেই মহিয়ান গরিয়ান পরাক্রমশালী ভাগ্য নিয়ন্তার হাতে সঁপে দিলাম। মানুষ এছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে?

মানবিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার একটি সীমারেখা থাকে। সীমা শেষ হয়ে গেলে মানুষ একমাত্র মহান প্রভুর সন্তুষ্টি ও সাহায্যের প্রত্যাশী হয়, ঠিক আমিও তেমনি হলাম। আর এভাবে দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ থাকার কারণে আমাকে তন্দ্রায় পেয়ে বসেছিল। হঠাৎ এয়ার হোস্টেসের মধুর আওয়াজে সে তন্দ্রাভাব কেটে গেল এবং সেফটি বেল্ট খোলার অনুমতি পেয়ে গেলাম। বিমান এখন বরফাচ্ছাদিত হিমালয় পর্বতের উপর দিয়ে যাচ্ছে। মাউন্ট এভারেষ্ট ডানদিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফলে বিমানের অধিকাংশ যাত্রীই একনজর এ পর্বত চূড়াকে দেখার জন্য বিমানের ডানদিকের জানালার পাশে এসে ভীড় জমিয়েছে ঠিকই তবে অনেকে ভালভাবে ঐতিহাসিক পর্বত চূড়াকে

দেখতে পেল না। বিমান দ্রুতগতিতে এ পাহাড় অতিক্রম করতে না করতেই এয়ার হোস্টেস ঘোষণা করল যে, আমরা এখন বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি এবং কর্ণফুলি নদীর ডেল্টা আমাদের নিচে আর ডেল্টা বিদ্যুৎ প্রস্তুত কেন্দ্র কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তাছাড়া গোধূলির পড়ন্ত বেলায় সূর্যের আলোকরশ্মি কর্ণফুলি নদীতে এক মনমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে। আর এ মনোহরী দৃশ্য দুই নয়নে অবলোকন করার জন্যে গোধূলি বেলা সমুদ্রতীরে জনতার ঢল নামে।

এ নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করার কারণে আমার স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে উঠে আমার অতীত জীবন যে, আমি তার বিলা জয়েন্ট বেঞ্চার (টি.জে.ভি) কোম্পানীতে এসিস্টেন্ট পাবলিক রিলোজিয়ন অফিসার ছিলাম। মোটা অংকের ভাতা পেতাম। কোম্পানী আমাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল, যার ফলে জীবন শান্তিতেই কাটছিল। তখন ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছিল। প্রচার মাধ্যম সফলতার আকাশ-কুসুম দাবী করছিল। কখনও সাহায্যের, কখনও আমেরিকার ষষ্ঠ রণতরী আগমনের মন মাতানো গীত শুনানো হচ্ছিল। তাছাড়া ইউ.এন.ও-তে হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দাবী করছিল। এদিকে আমাদের সেনা প্রধান এমনি এক কৌতূহলী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন যার কারণে মনে হচ্ছিল যে, কয়েক দিনেই ব্রাহ্মণ্যবাদের বারটা বেজে যাবে এবং যুদ্ধ বন্ধের বিনিময়ে ভারত কবলিত কাশ্মীর আমাদেরকে হাদিয়া দিবে। জেনারেল নিয়াজি তখন পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের সেনাপতি। তার গালগর্ভ বহুল প্রচারাভিযান চালানো হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে হটিয়ে সীমান্তে ঠেলে দিয়েছি। ভারতীয় ট্যাংক আমার লাশ মাড়িয়ে তবেই মুসলিম ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে। পক্ষান্তরে বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টো, যা জাতি কখনও কল্পনাও করেনি। আর আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, কিভাবে মুসলমান হিন্দুদের সামনে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করে অথচ মুহাম্মদ বিন কাসিম কয়েক হাজার যুবকের সমন্বয়ে রাজা দাহিরকে পরাজিত করেছেন। সুলতান মাহমুদ গজনবীর ১৭টি অব্যর্থ আক্রমণ যার আরোহীর সংখ্যা কখনও দশ হাজারের বেশি ছিল না। তদুপরি ভারতবর্ষের রাজাদের লাখ লাখ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছেন এবং সোমনাথ মন্দির পদানত করে অগণিত সোনা-রূপা হস্তগত করে। সোমনাথ মন্দিরের মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ইতিহাসের দেয়ালে নিজেকে মূর্তি বিক্রিকারীর স্থলে মূর্তি ধ্বংসকারী হিসাবে সাঁটিয়েছেন। হিন্দুরের মধ্যে সবচেয়ে বাহাদুর

পরিবার রাজকুমারদের সবচেয়ে উঁচু সূর্যবংশের অহংকার পদদলিত করে বাদশাহ আকবর বিবাহ করেন যেখানে হিন্দু ধর্মে মুসলমানদের ছায়া মাড়ানোতে নাপাক হয়ে যায়। আহমদ শাহ আবদালী রাজা জয়চন্দ্রকে কয়েকবার পরাজিত করেন এবং প্রত্যেকবার তাকে নিজের পা ধৌত করিয়ে মুক্তি দেন। তাছাড়া মুসলমান তো সেই জাতি যারা মদিনা থেকে বের হয়ে একদিকে আফ্রিকা বিজয় করে ইউরোপ, স্পেন ও আলবানিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। অপরদিকে ইরান, আফগানিস্তান, ভারত ও রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য জয় করে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়িয়েছিলেন। সেই জাতি যার মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মুসা বিন মুসাইর, নূরুদ্দীন জঙ্গি, সালাহুদ্দিন আইউবী, মুহাম্মদ বিন কাসিম, মাহমুদ গজনবী এবং টিপু সুলতানের মত অকুতোভয় জেনারেলের জন্ম হয়েছে, যাদের নাম শ্রবণান্তেই অমুসলিম শাসক ভয়ে থরথর করে কাঁপত। সেই জাতির সবচেয়ে বৃহদাংশ এমন এক জাতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে যে জাতির উপর মুসলমানরা হাজার বছর পর্যন্ত শাসন করেছিল। মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসে এ ব্যর্থতার এমন আর নজির নেই। ধর্মবিমুখতা আমাদেরকে আজ কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। কখনো যেন এত দূর চলে না যাই যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে যায়। পরস্পর হাতাহাতির পরিবর্তে সম্মিলিতভাবে সকল তাগুত শক্তির ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে হবে। আর এর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সফলতা।

অমুসলিম পরাশক্তি বিভিন্নভাবে আমাদেরকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেমনিভাবে স্পেন। যেখানে মুসলিমরা ৮০০ বছর শাসন চালিয়েছিল সেখানে আজ একজন স্পেনীয় মুসলমানের অস্তিত্ব নেই। তেমনিভাবে অমুসলিম মিশনারীর লক্ষ্য হল পৃথিবীর বুক থেকে মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে দেওয়া। অতঃপর অবশিষ্ট থাকবে শুধু নামকাওয়াস্তে মুসলমান। যাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, চাল-চলন ও আদর্শ হবে বিধর্মীদের অনুকরণে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাবা শরীফে শত শত মূর্তি রাখা ছিল। যার মধ্যে দুটি বড় মূর্তি। যাদের নাম ছিল যথাক্রমে লাত ও মানাত। এ দুটি মূর্তি অন্য সকল মূর্তির সরদার ছিল। মূর্তিপূজার প্রভাব হিন্দুস্থান থেকে হেজাজ ও মক্কা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। হিন্দুদের কথা মত মানাতের চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিধর ছিল সোমনাথ মূর্তি। এ মূর্তিটি মন্দিরের এক বিশেষ কক্ষে শূন্যে

ঝুলানো ছিল। সেই কক্ষের ফ্লোর, ছাদ এবং দেয়াল চৌম্বিক লোহার দ্বারা নির্মিত ছিল। সোমনাথ মূর্তিকে এমনভাবে ঝুলানো হয়েছিল যে, ছাদ এবং ফ্লোরের চৌম্বিক আকর্ষণেই তা শূন্যে দোলায়মান দেখা যেত। এ কারণেই তাকে মূর্তিদের সরদার বলা হত। হিন্দু মতবাদীরা প্রত্যেক শক্তিধর বস্তুকেই তাদের ধর্ম দেবতা মনে করে। সোমনাথ তাদের খোদা ছিল এবং তার এক শতাংশ কাবাতে মানাত নামে ছিল। মাহমুদ গজনবী সোমনাথ মূর্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফিরার সময় সোমনাথের দরজা সাথে নিয়েছিলেন যা কাবুলের যাদুঘরে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর অভিলাষে তদানীন্তন আফগান রাজা জহির শাহ সেই দরজা ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সেই দরজা লাগিয়েই ভারত সোমনাথ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করে যার ব্যাপক প্রচারণা করা হয়।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানী জাতির কাছে এক প্রেস কনফারেন্সে আবেদন করেন যে, যে তারিখে সোমনাথ মন্দিরের নব নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, সেই দিনে জন্মগ্রহণকারী সকল সন্তানের নাম মাহমুদ রাখার জন্য। বিশ্বজুড়ে শুধু মুসলিম উম্মাহকেই মার্শাল রেস অর্থাৎ যুদ্ধবাজ জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সেই মার্শাল রেসের সবচেয়ে বড় দেশের দুই টুকরো হওয়া এবং পৃথিবীতে সংখ্যাধিক্য মুসলিম সেনাবাহিনীর হিন্দুদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দেওয়ার ঘটনা কোন সাধারণ দুঃখবহ ঘটনা ছিল না। সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, আমি পাগল বেশে খুব দ্রুতগতিতে নিজের গাড়ি নিয়ে কোন গন্তব্যস্থল নির্ধারণ ব্যতীতই তারবিলা থেকে বেরিয়ে পড়ি। যখন হুঁশ ফিরে পেলাম তখন আমি ঝিলাম থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আমার একটাই কামনা ছিল যে, গাড়ি এক্সিডেন্ট করবে এবং আমি মারা যাব কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলাম। তখন চিন্তা করলাম নিরাশ হওয়াতো অমার্জনীয় অপরাধ। কোন কারণ ব্যতীত অযথা নিজের জীবনকে কেন ধ্বংস করব। না! নিজের জীবন ধ্বংস করব না বরং তা দেশ ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করব।

কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার এবং আমি যেহেতু একই অফিসে বসতাম, ফলে দিনে কয়েকবার তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হত। ২০/২১ ডিসেম্বর তিনি আমার রুমে এসে আমাকে বললেন, আমি তোমাকে সন্তান জন্মগ্রহণের সু-সংবাদ দিব, না মুসলিম দেশের দুই ভাগ হওয়া ও পরাজয়বরণের শোকবাণী শোনাব। প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বললাম, জাতির উত্থান পতনের ইতিহাসের ৩৪ বছরের ব্যবধানে কোন বাস্তব বা

মীমাংসাকারী প্রতিক্রিয়া নেই। ৬ বছর পূর্বে এই ভারতকেই আমরা এমনভাবে পরাজিত করেছিলাম যে, তখন যুদ্ধ চলাকালেই তাদের রাষ্ট্রপ্রধান জাতিসংঘ বলেছিল যে, আমরা এখন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত। যুদ্ধ বিরতির সাথে সাথে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী অভাবনীয় পরাজয় থেকে রক্ষা পাওয়ার আনন্দ সহ্য করতে না পেরে সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। ৬৫-র যুদ্ধে পাকিস্তানের সীমানা থেকে ২৪০ মাইল দূরে ভারত সরকার ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে এলাহাবাদে স্থানান্ত র করে এবং এর পর পরই যুদ্ধের ঘোষণা ছাড়াই ভারত আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলে বর্ডার থেকে মাত্র ১৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত লাহোর এবং ৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত শিয়ালকোটের মত গুরুত্বপূর্ণ শহরও তাদের নগ্ন হামলা থেকে রেহাই পায়নি। তখন ভারতের কমান্ডার ইন চীফ ঘোষণা করেছিল যে, তৃতীয় প্রহরে আমি লাহোরের জিমখানায় চা পান করব।

৬ই ডিসেম্বর ৬৫ খৃষ্টাব্দ। যেদিন সকাল ৪টায় ভারত পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছিল, ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর জম্মুর সামরিক ছাউনিতে আমাদের পতাকা উড্ডীন ছিল। ভারত সীমান্তের ১১ মাইল ভিতরে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বড় শহর খেমকারন আমরা দখল করে ফেলি। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারত এয়ার ফোর্সের ৩০০'র বেশি বিমানকে আকাশে এবং বিমান বন্দরেই ধ্বংস করে ফেলি। আমাদের বাঙ্গালী পাইলট মাহমুদ আলম শের যিনি শুধার বিমান বন্দরে আক্রমণকারী মিগ-১৯ বিমানকে ৪৫ সেকেন্ডে মিগ-১৯-এর চেয়ে ছোট বিমান এফ '৮৬ দ্বারা ভূপাতিত করেন। তখন আমাদের সমস্ত জাতি এক ছিল। যেমন হাতের আঙ্গুলি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলে ঘুষি হয়ে যায়। আমরা তখন আলাদা আলাদা ছিলাম না। পুরো জাতি একটি ঘুষির আকারে ছিলাম। ভারত তো পাকিস্তানের ঘুষিকে এমন ভয় পায় যে শহীদ লিয়াকত আলী খান ভারতকে শুধু ঘুষিই দেখিয়েছিলেন। এতেই ভারত ভয়ে নিজের সেনাবাহিনী হটিয়ে বর্ডার থেকে অনেক পিছনে নিয়ে যায়। কিন্তু আফসোস! জাতি আজ রাজনৈতিক নেতাদের প্রলোভনে পড়ে বিভক্ত। যার পরিণতি আমরা পরাজয়ের আকৃতিতে পেয়েছি।

আমি জেনারেল ম্যানেজারকে বললাম, আপনি আমাকে সন্তান জন্মগ্রহণের সু-সংবাদ দিন। কেননা এই সন্তান এক নতুন প্রভাতের সু-সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছে। এই সকল কথা বলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম কিন্তু মনকে বাগে আনতে পারছিলাম না। পরিশেষে '৭২ খৃষ্টাব্দে

আমি চাকরি হতে ইস্তফা দিলাম। এক মাসের নোটিশ প্রেড পুরো করে নিজের পরিবার পরিজনকে গ্রামের বাড়িতে রেখে রাওয়ালপিন্ডিতে চলে আসলাম এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সি.আই.ডি অফিসে গিয়ে নিজেকে যে কোন বিপদসংকুল কাজের জন্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পেশ করলাম। সি.আই.ডি অফিসারগণ তো প্রথমে চিন্তায় পড়ে যান যে, এই চরম নিরাশার দিনে একজন সিভিলিয়ান নিজেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পেশ করছে। আনুমানিক ২০ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের ইন্টারভিউ চলতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তারা আমার অতীত কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করেন। যখন তারা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হলেন তখন আমাকে জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে সম্মুখীন বিপদের ও গ্রেফতার হওয়ার অবস্থায় সীমাহীন নির্যাতনের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলেন। কেননা তারা ইচ্ছা করেছিলেন যে, এই বিভাগে কাজ করা সম্পর্কে আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা যদি সামরিক আবেগের বশবর্তী হয়, তবে আমি যেন ফিরে যাই। কিন্তু আমার দৃঢ়তা যখন প্রমাণ করল যে, আমি শুধু আবেগপ্রবণ নই বরং ইসলাম ও মাতৃভূমির জন্যে যে কোন ত্যাগ ও কোরবানী করার জন্যে আন্তরিকভাবে প্রস্তুত তখন প্রথম সাক্ষাৎ থেকে এক মাসের মধ্যে নিয়মিতভাবে গুপ্তচর বিভাগের কাজে শামিল করে নেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়। আমার ট্রেনিংয়ের জন্য ৬ মাস সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা আমি মাত্র ৪ মাস সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করি। সীমাহীন শারীরিক নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করার পদ্ধতি এবং যদি নিজে ফেঁসে যাই তা থেকে মুক্তির পদ্ধতি শিখানো হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এরই মাঝে ভারতীয়দের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, ভাষা, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাপন সম্পর্কে শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমাকে পরিপূর্ণভাবে একজন ভারতীয় শহরের বাসিন্দা বানিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ভারতের সেনাবাহিনী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অবগত করানো হয়। তাদের ট্রেন, বাস শহর বন্দর গ্রাম মোটকথা খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয় যা একমাত্র একজন দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির কাছেই আশা করা যায়। তদ্রুপ আমার মন ও মগজে বসিয়ে দেওয়া হয় যে, আমি একজন পরিপূর্ণ ভারতীয় শহুরে বনে গেছি। তারপর কঠোরতা সহ্য করার ট্রেনিং ও শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের সবক দেওয়া হয় এই জন্য যে, আমি যেন কষ্ট সহ্য করতে পারি। অতঃপর ওয়ারলেস অপারেট করা, ছাউনি ও সেনা ক্যাম্পে আক্রমণ ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি মোটকথা, দক্ষতার সাথে যেন সকল দায়িত্ব পালন

করতে পারি সে জন্য আমাদের পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ট্রেনিংয়ের সর্বশেষ অধ্যায়ে এসে আমাকে এমন একটি পরীক্ষা দেয়া হল্যো যাতে উত্তীর্ণ হতে পারলেই আমাকে দায়িত্ব দেয়া হবে। ইসলাম ও দেশ মাতৃকার জন্মভূমির জন্য এই উত্তীর্ণমূলক পরীক্ষায় আমি শুধু কাঙ্ক্ষিত তথ্যই অর্জন করিনি বরং তার জন্য কতিপয় গোয়েন্দাবিষয়ক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে গুরুজনদের কাছে সরবরাহ করি। যদ্দরুন আমাকে গ্রুপ লিডার হিসাবে মনোনীত করা হয়। আমার গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন– যারা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কাজে পারদর্শী ছিল। তারা ওয়ারলেস টেকনিশিয়ান ও ব্লাসটিংয়ে দক্ষ। অপারেশন চলাকালীন বিপদাপদ আঁচ করতে পারতো। তারা আমাদের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কোথাও ধরা পড়ে গেলে শত্রুকে পরাস্ত করা অথবা ঘায়েল করা ছিল তাদের দায়িত্ব। মোটকথা, তারা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রুপ। গ্রুপ লিডার হিসাবে তারা আমার প্রত্যেক আদেশ পালনে অভ্যস্ত। নিজেদের ইচ্ছা মাফিক কোন কাজ বাস্তবায়নের অনুমতি তাদের নেই। আমরা সকলেই পৃথক পৃথক থাকি। তারা আমাকে ছাড়া পরস্পর যোগাযোগ করতে পারে না। আমি তাদের সকলের অবস্থান জানি, কিন্তু তারা আমার অবস্থান জানে না। ভারত মিশনে সহযোগিতাকারীদের সাথে যোগাযোগের জন্য শুধু আমারই অনুমতি রয়েছে। মুদ্দাকথা, এই পাঁচ সদস্যের ছোট সৈন্যদল স্বীয় মিশনের জন্য এখন পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত।

আমাকে ২৪ ঘন্টার প্রোগ্রাম মত মিশন পরিচালনা করতে হচ্ছে। আমাদের পাঁচজনকে প্রাথমিক ট্রেনিং সমাপ্তির পর ক্ষণিকের জন্য একত্র করা হয়েছিল। একে অপরের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কেউ জানি না। এটা গোয়েন্দা বিভাগের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জন্যে যে, যাতে কেউ ধরা পড়ে গেলে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে যেন বাকী সাথীদের ব্যাপারে কিছু বলতে না পারে। সর্বশেষ কাজ যা নিজেদের গোপন রহস্য ও সাথীদের ব্যাপারে সংরক্ষণের জন্য করা হয়েছে তাহলো, আমাদের প্রত্যেকের দাড়ি ফেলে দিয়ে তার স্থলে প্লাস্টিকের মজবুত দাঁড়ি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন কঠোরতা সহ্য করার শক্তি না থাকবে তখন দাঁড়ি খুলে যেন চিবানো যায়, আর এ দাড়িতে সাইনাইড ভর্তি রয়েছে। শত্রুকে গোপন রহস্য বলে দিয়ে গাদ্দার হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে শহীদ হয়ে যাওয়া অনেক শ্রেয়। যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে। এটাই হলো আমাদের ট্রেনিং ও আবেগ। যার মাধ্যমে স্বীয় মিশন সফল করার জন্য

প্রস্তুত করা হয়েছে আমাদেরকে।

আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বীয় মিশনে যাওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর ভারত ৮০ ভাগের চেয়েও অধিক সেনা পশ্চিম বর্ডারে এনেছে। ইন্টিলিজেন্স রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায়, পরাজিত এলাকার পর ভারত মুসলমানদের এই মুসিবতের দিনে পাকিস্তানকে করতলগত করতে চায়। ভারতের নিজের সৈন্যের চেয়ে অধিক গর্ব ও অহংকার রাশিয়ার সাথে সামরিক চুক্তির। যার ফলে ভারতের আক্রমণ মানে রাশিয়ার আক্রমণ মনে করা হচ্ছে। মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধকালীন ভারত ও রাশিয়ার মাঝে চুক্তির কারণে শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করছে এবং ভারত এ কারণেই পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। যে কারণে তারা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার দুর্বল স্থানে প্রবল আক্রমণ করে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে চেয়েছে। ফলে যুদ্ধ বিরতির সময় পাকিস্তানের ৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা ভারতের অধীনে চলে যায়। এ সময় শুধু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীই নয় বরং পুরো জাতি নিরাশার নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত ছিল।

আমাদের গ্রুপ রয়েছে স্টান্ডবাই পজিশনে। আমাদেরকে তিন দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের সমস্ত ছামানা বাড়িতে রেখে আসার জন্য। শুধু পরিধানের কাপড়, এক জোড়া জুতা এবং অতিরিক্ত দুই সেট জামা কাপড় আনার জন্য বলা হয় যার মধ্যে এমন কোন চিহ্ন থাকবে না যে, তা পাকিস্তানে বানানো হয়েছে। এই দুটি হচ্ছে আমাদের যাত্রার গ্রীন সিগন্যাল। আমাকে একটি ফরমে আমার পরিবারের সদস্যদের নাম লিখতে বলা হয়, যার এক কপি আমাকে পরিবারের সদস্যদের দেওয়ার জন্য প্রদান করা হয়। আর আমার অন্য ৪ সাথী সেনাবাহিনীতে ছিল বলে পূর্ব থেকেই তাদের ফরম পূরণ করেছে। ফরমে অপারেশনকালীন মৃত্যুতে মোটা অংকের টাকা ও অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদানের ওয়াদা রয়েছে। আমার আম্মা জীবিত। এছাড়া বাড়িতে আমার স্ত্রী ও একটি পুত্র সন্তান রয়েছে যার বয়স মাত্র কয়েক মাস। আমি পরিবারের মধ্যে প্রথমে আমার মায়ের নাম লিখি, অতঃপর তিন দিনের ছুটি কাটাতে যাত্রা করি। বাড়ি পৌছে আমি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার পূর্ণ চেষ্টা করি। আমার স্ত্রী তো কোন কিছু বুঝতেই পারেনি। কিন্তু আম্মাজান আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছু কিছু আঁচ করতে সক্ষম হন। আমি আমার বাড়ির কাউকেই এ সম্পর্কে কিছু বলিনি, আমি কি করতে যাচ্ছি এবং কোথায় যাচ্ছি। তারা শুধু এতটুকু জানত যে, আমি লাহোরের এক প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করি। যাত্রার কিছুক্ষণ পূর্বে

মায়ের হাতে মুখবন্ধ একটি পত্র দিয়ে এই পত্রের হেফাজত করতে বলি। অতঃপর মরহুম আব্বাজানের কবর জিয়ারত করি। যাত্রার সময় মা, স্ত্রী ও ছেলের সাথে এমনভাবে মুলাকাত করি যেন এটাই আমার জীবনের শেষ সাক্ষাৎ। ভবিষ্যতে কোন সাক্ষাতের সুযোগ হবে না। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যেন চেহারায় তার কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না পায়। তার জন্য মা ও স্ত্রীকে আমি শুধু এতটুকু বলেছি যে, কোম্পানীর পক্ষ থেকে হয়তো আমাকে কয়েক মাসের জন্য শ্রীলংকা যেতে হতে পারে। এজন্য আমার পত্র আসতে দেরী হতে পারে। আমি ফোনে অফিস থেকে আপনাদের খবরা খবর জেনে নিব এবং অফিসের লোক মারফত আমার বেতন আপনার কাছে পাঠানো হবে। আমার খবরা খবরও আপনাকে জানানো হবে। এ সকল কথাবার্তা হুবহু আমার সিনিয়র অফিসারের কথা অনুযায়ীই বলি। পরিবারের কাছে এ ব্যবস্থা আশ্চর্য মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমি প্রশ্ন করার কোন সুযোগই দেইনি।

সন্ধ্যা সাতটায় স্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। সকাল ৮ টায় আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। আমাকে এক রুদ্ধ জীপে করে চোখে পট্টি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল এবং যখন চোখের পট্টি খোলা হলো তখন আমরা একটি হল রুমে উপস্থিত। সেখানে অনেক চেয়ার খালি অবস্থায় রয়েছে। আমাদের সিনিয়র অফিসারও আমাদের সাথে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে সিভিলিয়ন পোশাকে এক ভদ্রলোক রুমে প্রবেশ করলেন। সিনিয়র অফিসার তাকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করলেন। ভদ্রলোক পৃথক পৃথকভাবে আমাদের সাথে মুসাফাহা করলেন। সফলভাবে ট্রেনিং সমাপ্তির জন্য মুবারকবাদ দিয়ে বললেন, আপনারা পাঁচ সদস্য যে মিশনের জন্য যাচ্ছেন তা সফল হলে পাকিস্তানের অনেক সহযোগিতা হবে। এজন্য আন্তরিকভাবে মিশনের সফলতায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে পূর্ণতায় পৌছাতে হবে। এর মধ্যে যদি গাদ্দারির জীবন ও শাহাদাতের মধ্য হতে কোন একটা গ্রহণ করতে হয় তবে শাহাদাতকেই গ্রহণ করবেন। কেননা, মৃত্যু তো নিশ্চিত একদিন আসবেই। আমাদের শত্রু এত ধোঁকাবাজ যে, জীবিত রাখা ও আরাম আয়েশের মিথ্যা অঙ্গীকার করে গোপন রহস্য উন্মোচন করা তাদের চিরাচরিত ধর্ম মনে রাখবেন। সমস্ত ভেদ আয়ত্ত করার পর তারা আপনাদেরকে ছেড়ে দিবে না বরং সীমাহীন দুঃখ যাতনা ও নিপীড়নের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে। এ সময় তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। শহীদ সুলতান টিপু (রহ.)-এর সাথে গাদ্দারীর পুরস্কারস্বরূপ মীর সাদেককে ইংরেজ জায়গীর ও সপ্তপুরুষ পর্যন্ত ভাতা প্রদান করে সম্মানিত করেছিল। ভাতার যোগান দেয়া হত

শ্রীঙ্গাপটম ব্যাংক থেকে। ইংরেজ তো শুধু রাষ্ট্রের আমলা হিসাবে কাজ করতো। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অন্যান্য বিভাগে হিন্দুস্থানী কর্মীদেরই নিয়োগ দেয়া হত। আলোচনা সাপেক্ষে এর বাস্তবতা কতটুকু আশ্চর্য ও দুঃখজনক যে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্ত পর্যন্ত পুরা উপমহাদেশে ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা কখনও ২৫০০ থেকে বেশি হয়নি। এই ২৫০০ হিন্দুস্থানী কর্মচারীর মাধ্যমে (যাদের শতকরা ৮০ ভাগ হিন্দু) পুরা উপমহাদেশে ইংরেজরা নির্বিঘ্নে শাসন পরিচালনা করত। এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা যে, মীর সাদেকের পারিবারকে যখন ভাতা প্রদানের জন্য ডাকা হত তখন চাপরাশী উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলত, মীর সাদেক গাদ্দারের পরিবার উপস্থিত আছে? শহীদ যেমন সর্বদা জীবিত থাকে তদ্রুপ গাদ্দারের গাদ্দারি তার মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায় না। বরং বংশ পরম্পরায় তার সন্তানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন গাদ্দার ছিল। তিনি একটি উদাহরণ দিলেন যে, বাহাদুর শাহ জাফরের শ্বশুর হাকীম আহসান। তিনি বাহাদুর শাহকে গ্রেফতার করিয়েছিলেন। তার সন্তানাদি ভারত বিভক্তির পর স্থানান্তরিত হয়ে করাচীতে চলে এসে সরকারী চাকরি ও ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু তারা তাদের নানা হাকীম আহসানের নাম উচ্চারণ করে না। যদি কেউ কদাচিৎ জেনে যায় তবে তাকে অত্যন্ত অনুনয়ের সাথে বলে যে, এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। এ সংক্ষিপ্ত উপদেশ সম্বলিত আলোচনার পর তিনি আমাদের সাথে মুআনাকা করে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন।

তার চলে যাওয়ার পর আমাদের প্রত্যেকের শরীর ও সাথে আনা এক এক জোড়া কাপড় পরিপূর্ণ চেক করা হলো। সিগারেট, ম্যাচ, থলে সব নিয়ে নেওয়া হলো এবং ভারতীয় সিগারেট ম্যাচ থলে প্রদান করা হলো। যার মধ্যে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা ছিল। দু'জন ডাক্তার আমাদের নকল দাড়ি পিনের সাহায্যে লাগিয়ে দিলেন। তার সাথে এমন কিছু ক্যামিকেলও লাগিয়ে দিলেন যা দাড়িকে মজবুত করে দিয়েছে। আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে ভারতীয় মুদ্রা দেওয়া হলো এবং সিনিয়র অফিসার আমার দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে ধরলেন যার উপর দিল্লি, আগ্রা ও বোম্বের এমন কিছু লোকের ঠিকানা লেখা আছে যারা ভারতে সার্বক্ষণিক আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবে। সিনিয়র অফিসার আমাকে উক্ত ঠিকানা এবং নামগুলো ভালভাবে মুখস্ত করতে বলে দিলেন।

আমরা যে মিশনে যাচ্ছিলাম তার মধ্যে প্রায় ডজন খানেক কাজ রয়েছে। তাছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে কাজ দেশের জন্য কল্যাণকর মনে হবে তা করার ব্যাপারে আমাদের অনুমতি আছে। অর্থাৎ আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন মিশন নেই বরং শত্রুসম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য হাছিল করা এবং শত্রুর যাবতীয় গতিবিধি লক্ষ্য করা, সুযোগ সাপেক্ষে শত্রুকে বশ করা, পরাজিত করা কিংবা ঘায়েল করাই আমাদের মিশন। কোন পেপার ডুপ্লিকেট কপি করার জন্য বাজারে উন্নত কোন মেশিন এখনো আসেনি। তাই যা কিছু টাইপ করা হয় কার্বন পেপারের সাহায্যে তার কপি তৈরি করা হয়ে থাকে। কার্বনকে যদি একবার বা দুইবার ব্যবহার করা হয় তাহলে তার উপর টাইপকৃত শব্দ পরিষ্কারভাবে পড়া যায়। যদি এমন ব্যবহৃত কার্বন ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয় এবং ঝাড়ুদার অফিস টাইমের পর অফিস পরিষ্কার করার সময় তা বের করে আমাদের দিয়ে দেয় তাহলে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যাব। তাছাড়াও ব্রিগেডিয়ার এবং তার চেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসাররা নিরাপত্তার জন্য রাফ প্যাডে যা কিছু লিখে তার খালি পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলে। কেননা কলম দ্বারা লেখার সময় অপর খালি পৃষ্ঠায় লেখার আবরণ দাগ বা রেখা পড়ে তা যেন কারো হস্তগত না হয় সে জন্য উচ্চস্তরের অফিসারগণ রাফ প্যাডের নিচের খালি পৃষ্ঠা দুই তিন টুকরা করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেয়। সেই ময়লার ঝুড়িও আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। আমার বিশেষ টার্গেট হচ্ছে চীফ অফ আর্মি স্টাফের টাইপিস্ট এবং সদর দপ্তরের অন্যান্য টাইপকারী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মীদেরকে বিভিন্নভাবে লোভ-লালসার ছলে আয়ত্বে এনে কাঙ্ক্ষিত কার্বন ও ছেঁড়া টুকরো কাগজ হস্তগত করা ও এ মিশনে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্তত একবার যদি কাউকে বাগিয়ে নেওয়া যায় তবে তার দ্বারা পরবর্তীতে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা খুব বেশি কঠিন কিছু নয়। ভারত এবং পাকিস্তানে গোয়েন্দা বিভাগে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে যে, জাসুসকে বেশভুষা ও শারীরিক দিক থেকে এমন হতে হবে যেন প্রয়োজনে ১০০ মানুষের মাঝেও সে আত্মগোপন করতে পারে। উভয় দেশের গোয়েন্দারা ফকির পাগল ও ভণ্ড পীর বা নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের বেশ ধরে শত্রুদেশে কাজ করে থাকে।

ভারত ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের ট্রেনিং বেশির ভাগ একই সময়ে স্কটল্যান্ডে হয়ে থাকে। মূলত উভয় দেশের অফিসারদের একই পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়। যেমন আমেরিকা পাকিস্তান এবং ভারত উভয় দেশের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ অনুশীলন করে। এই যৌথ অনুশীলনে

আমেরিকার মূল অভিসন্ধি হচ্ছে আমাদের সৈন্যদের যোগ্যতা যাচাই করা এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইসরাইলকে দেওয়া। আর যেহেতু ভারত নীতিগত দিক থেকে ইসরাইলের বন্ধু তাই হাত বদল হয়ে এ সমস্ত তথ্য এক সময় ভারতে পৌছে যাবে। কিছুকাল পূর্বেও ভারতের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির এ গুরুদায়িত্ব পাকিস্তানী সিভিল অফিসারগণ পালন করতেন। পরবর্তীতে এ কাজ পাকিস্তানী রাজনীতিবিদগণ পালন করেন। অর্থাৎ শত্রুকে নিজেদের গোপন তথ্য সরবরাহ করা অন্যথায় কোন সৈনিক শিখ জাতি পূজারিদের তালিকা ভারতকে দেয়নি। কোন সৈনিকই ভারতের ট্যাংকে বসে পাকিস্তান প্রবেশের উক্তি করেনি। কোন সৈনিকই এ ঘোষণা দেয়নি যে, পাকিস্তানের কাছে পারমাণবিক বোমা আছে এবং কোন সৈনিকই একক ভারতপ্রিয় জাতিকে সম্মান করেনি। এই পুণ্য কাজটি কেবল রাজনীতিবিদরাই বাস্তবায়ন করছেন।

পাকিস্তানের মত ভারতের পুলিশ এবং সিবিআইও শুধুমাত্র নিম্নমানের হোটেলেই অবস্থান করত। তাদের উন্নত মানের ফাইভস্টার হোটেলে প্রবেশ করার সাহস হত না। ফলে আমাকে সম্ভ্রান্ত সোসাইটিতে মিশে যাওয়া এবং উন্নতমানের হোটেলে অবস্থান করার পদক্ষেপ নিতে হবে। সম্ভবত উচ্চতা ও গঠনের দিক থেকে আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে এ ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা আমার অস্বাভাবিক উচ্চতা ও আকৃতির কারণে অন্ততপক্ষে আমাকে পাকিস্তানী জাসুস মনে করার যথেষ্ট যুযোগ রয়েছে। তারবিলাতে চাকরিকালীন সেখানে বিদেশী অফিসার ও তাদের ফ্যামিলিদের জন্যে নির্মিত ক্লাবে আমার যাতায়াত ছিল। আমি তখন আকর্ষণীয় বিভিন্ন প্রকারের ড্যান্স ও বাদ্যযন্ত্র চালনায় নৈপুণ্য অর্জন করেছিলাম। ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে হয়ত তা আমার কোন কাজে আসতে পারে।

ভারতে চোপড়া পরিবার সুপরিচিত। এরা মূলত পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত এবং শারীরিক গঠনের দিক থেকে এরা দীর্ঘদেহী সাদা রঙের হয়ে থাকে। এই পরিবারের বা বংশের লোক হিসাবে আত্মপরিচয় দেয়ার জন্য আমার নাম দেয়া হয় উনুদ চোপড়া। চোপড়া পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি এবং চলচ্চিত্র জগতে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই পরিবার সারা ভারতে বিস্তৃত রয়েছে। এমনিভাবে আমার অন্য সাথীদেরও বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে।

বিস্তারিত মিশনে প্রবেশের পূর্বেই আমি কিছু কথা আপনাদের অবগত করাতে চাই। একজন গোয়েন্দার জন্যে তার জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান তার মিশন সফল করা। ভারতে হিন্দু নাম ধারণ করে প্রবেশ করার পর হয়ত

আমাকে সম্পূর্ণ হিন্দুর বেশে কাজ করতে হবে। এজন্য আমাকে এমন কাজও করতে হতে পারে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আমাকে মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্য যে মিশন অর্পণ করা হয়েছে তা যে কোন বিনিময়ে সফল করাই আমার একমাত্র অভিষ্ট। শরীয়তবিরোধী ও ইসলাম পরিপন্থী কোন কাজ যদি করতে বাধ্য হই তাহলে সেই অপরাধের জন্য সেই পবিত্র সত্তা রহমান ও রাহীমের দরবারে এই বলেই ক্ষমা চাচ্ছি যে, আমি দেশ মাতৃকা তথা মুসলমানদের এক পবিত্র ভূমিকে তোমার দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আত্মনিবেদিত। আমি স্বেচ্ছাপরাধী নই।

ইতিমধ্যে মিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশে আমাদের সফর শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে আসা হয়েছে। সতর্কতার কারণে আমাদের পুনরায় ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে এবং নিরাপত্তার সংকেতগুলো দ্বিতীয়বার আলোচনা করা হয়েছে। দুপুর তিনটায় আমরা দুটি প্রাইভেট কার যোগে রওয়ানা করলাম লাহোর রেল স্টেশনের উদ্দেশে। ট্রেনে বছিরপুর ফাসুরা যাওয়ার টিকিট পূর্বেই কাটা হয়েছিল। ট্রেন স্টেশনে অবস্থান করছিল। আমরা সেকেন্ড ক্লাশের এক বগিতে পৃথক পৃথক আরোহণ করলাম। এখনও আমাদের সাথে দু'জন সিনিয়র অফিসার আছেন। গাড়িতে আমাদের পারস্পরিক আলোচনার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অতএব, আশা করি কেউ এ নিয়ম-নীতির বারটা বাজাবে না। এখন রাত প্রায় সাড়ে ১১টা বাজছে। আমরা বছিরপুর পৌঁছে গেছি। এখানে এক সেফ হাউসে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা হাউসে পৌঁছার সাথে সাথে হাউসের এক কক্ষ থেকে চিৎকারের আওয়াজ কানে আসছিল। আমাদের জিজ্ঞাসু নেত্র দেখে সিনিয়র আমাদেরকে বললেন, ক'জন ভারতীয় বর্ডার ক্রস করার সময় ধরা পড়েছে, তাদের টর্চারিং চলছে। সেফ হাউসের অধিবাসীরা সার্বক্ষণিক একেবারে চুপচাপ। নীরবভাবে তারা আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছে। আমরা তাদেরকে কোন প্রশ্ন করলে জবাবে তারা শুধু একটু মুচকি হেসে চুপ হয়ে যায়। কিন্তু মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করে না। আমার মন বলছে যে, এরাই যথার্থ প্রশিক্ষিত। নীরবভাবে রাত্রি যাপনের পর সকাল ৯টায় আমরা বছিরপুর থেকে একরঙা তিনটি জীপে আরোহণ করলাম। পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে আমাদেরকে অজ্ঞাত রাখা হয়েছে।

সফর ধারাবাহিকভাবে চলছে। কখনও নদীর কোল ঘেঁষে কখনও বা এবড়ো থেবড়ো কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এল, এমন সময় আমরা এক সেনা ছাউনিতে পৌঁছে গেলাম। এখানকার পাকিস্তান বর্ডার

কোর্সের যুবকেরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। যদিও স্থানটি আমাদের অপরিচিত কিন্তু তথাপিও উক্ত স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে আমাদের সিনিয়র অফিসার বললেন, আমরা এখন ভাওয়াল নগরে সাকগঞ্জ বাজারের নিকটবর্তী বর্ডার থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে আছি। কিছুক্ষণ পর অপরিচিত দু'জন ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাত করানো হল। আমরা ভারতে পৌছার ঠিক দশ দিন পর দিল্লীতে তাদের মধ্য হতে একজনের সাথে সাক্ষাত করব। মিটিংয়ের স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শুধুমাত্র আমাকে জানানো হয়েছে। এই দুই ব্যক্তি মূলত লাহোরের প্রসিদ্ধ স্মাগলার। সপ্তাহে অন্তত দুইবার তারা এই পথে ভারত যেত এবং পান, সুপারী, এলাচি ইত্যাদি নিয়ে আসত। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তাদের বর্ডার পারাপারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, বিনিময়ে তারা পুরাতন গ্রুপের সংবাদ আনা নেওয়া করত। আর এখন থেকে এই দুই স্মাগলারকে শুধুমাত্র গ্রুপের জন্যেই নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। বর্তমানে তাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট সময়ে আমাদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে নিকটতম ভারতের রেল স্টেশন হনুমান গড় পর্যন্ত পৌছে দেওয়া। তাদেরকে টাকাও দেয়া হয়েছে হনুমান গড় থেকে আজমীর শরীফ পর্যন্ত আমাদেরকে টিকেট ক্রয় করে দেওয়ার জন্য। আমাদের টিকেট দিয়ে তারা বর্ডারের নিকটবর্তী এলাকা মির্জাপুরে পৌছে যাবে। সেখানে তাদের সাথে দুই ব্যক্তির সাক্ষাত হবে যারা পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সাথে থাকবে। আমাদের কারো হাতে ঘড়ি ছিল না। শুধুমাত্র আমাকে একটি ঘড়ি দেয়া হয়েছে, যা ভারতের তৈরি। এই ঘড়ির মূল্য ভারতে আনুমানিক তিনশ' টাকা।

রাতের খাবার সাড়ে আটটার মধ্যেই শেষ করি। খাওয়ার পরপরই আমাদেরকে একটা করে কালো লম্বা আন্ডার, একটা করে হাতাওয়ালা কালো গেঞ্জি দেওয়া হয়। আমরা বুট খুলে কাপড়ের সাথে বেগে রেখে দিই। অতঃপর সিনিয়র আমাদের সাথে খোশগল্পে মেতে উঠেন। কিন্তু তার এই গল্পের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আমাদের টেনশন দূর করা। অন্যথায় তার চেহারাতেও পেরেশানী বিরাজমান রয়েছে। দেশ ভাগের পর আমরা সিজ ফায়ারের অবস্থায় আছি। পাসপোর্ট ভিসার নাম গন্ধও নেই। বর্ডারের দুই' পাশেই রয়েছে সৈনিক সমাবেশ। এটাও হতে পারে যে, বর্ডার ক্রসিংয়ের সময় শত্রু গুলি করে আমাদের শেষ করে দিতে পারে। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, ভারত বর্ডারের নিকট পাকিস্তানের বি.আর.বি. নদীর মত একটি নদী খনন করেছে যা অনেক গভীর। পাকিস্তানের দিকে তা নিম্নমুখী আর

ভারতের দিকে একেবারে সোজা, তা আমাদেরকে নিঃশব্দে পার হতে হবে। তার ট্রেনিং আমাদেরকে খুব ভালভাবে দেওয়া হয়েছে। হনুমান গড় স্টেশন বর্ডার থেকে ৮ মাইল দূরে ছিল। পথে দুই তিনটা গ্রাম পড়বে, সেখানে আমাদের হিংস্র কুকুরের সামনে পড়ার বিপদ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। স্টেশনের কাছে গিয়ে আমাদেরকে প্যান্ট-গেঞ্জি খুলে সাধারণ শহুরেদের পোশাক পরিধান করতে হবে এবং অপরিচিত দুই গাইডারকে ফেরত পাঠাতে হবে। বঠন্ডা পর্যন্ত ভ্রমণকালে পৃথক পৃথক বসতে হবে এবং এ সময়ে একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এই ছিল আমাদের প্রতি সর্বশেষ উপদেশ। আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, ঠিক দশটা বাজলে অনবরত গুলি বর্ষণের আওয়াজ শুনতে পাব। আমাদের বর্ডার ফোর্স ছাউনি থেকে একযোগে আনুমানিক দুই এক কিলোমিটার দূর থেকে শত্রুর উপর ফায়ারিং-এ লিপ্ত থাকবে। আর এই ফায়ারিং আমাদের জন্য গ্রীন সিগনাল। যথা সময়ে ফায়ারিং শুরু হল। সিনিয়র আমাদের সাথে কোলাকুলি করলেন। তার আঁখি যুগল অশ্রুতে টইটম্বুর ছিল। তার সর্বশেষ শব্দমালা এমন ছিল– Wish you help and best of luck. আমার মানসিক অবস্থার ব্যাপারে আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, একদিকে বর্ডার ক্রস ও অপরদিকে মিশনের গুরুত্ব এ দুটি একাকার হয়ে গেছে। যার ফলে বাড়ি এবং পরিবারের কথা কিছুই মনে পড়ছে না। আমাদের প্রত্যেককে একটা করে ৩০ বোরের রিভলবার এবং ১০০ রাউন্ড গুলি, একটি ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট দেওয়া হলো। এগুলো আমরা বেগে লুকিয়ে রাখলাম। নদী পার হওয়ার সময় বেগ মাথায় বাঁধার জন্যে রশি দেওয়া হয়েছে।

রাত সোয়া দশটা বাজছে। এইমাত্র আমরা বর্ডারের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি পেলাম। আমরা সকলে আল্লাহ্ হাফেজ বলে সিনিয়রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গাইডের সাথে বর্ডারের দিকে চলতে শুরু করলাম। বর্ডারের আনুমানিক ১০০ মিটার এলাকা পানি কাদা ও লতা-পাতায় পরিপূর্ণ ছিল। আমরা ৮০ মিটারের মত দৌড়ে এবং বাকী ২০ মিটার হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করেছি। কাদা ও লতা-পাতায় গড়াগড়ির ফলে ময়লা আবর্জনায় আবৃত অবস্থায় আমাদের পরস্পরকে অপরিচিত মনে হচ্ছিল। উভয় দেশের সীমান্ত মধ্যবর্তী কোন চিহ্ন না থাকায় আমরা বুঝতেই পারিনি যে, ইতিমধ্যে আমরা ভারতে প্রবেশ করেছি। আমরা শুধু সম্মুখেই যাচ্ছি। এক সময় গাইড বলল যে, সামনে নদী। আমরা এক একজন করে নদীতে নামলাম। উভয়

দিক থেকে গোলা বৃষ্টির শব্দ ভেসে আসছিল। আমরা সোজা পজিশনে সাঁতরাতে শুরু করলাম। ভারতের দিকে নদী তীর পানি থেকে ৯০ ফিট উঁচু। যদ্দরুন তীরে উঠতে সময় লেগে গেল। সেই তীরে রয়েছে সরুপথ যার উপর বি.এস.এফ টহল দিচ্ছে। আমাদেরকে ক্ষিপ্ত গতিতে সেই সরুপথ পাড়ি দিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে হবে। সতর্কতার কৌশল হিসাবে সরুপথে আমাদের উল্টো পায়ে হাঁটতে হবে। ফলে যদি কেউ আমাদের পদচিহ্ন দেখেও ফেলে তবে সে বুঝবে যে কিছু মানুষ ভারত থেকে পাকিস্তানে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সরুপথ পাড়ি দিয়ে আমরা ক্ষেতের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। আমরা আইলের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলাম। ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট ডেরা রয়েছে। এ সমস্ত ডেরায় তাদের পোষা কুকুর থাকে। তাই যথা সম্ভব আমরা সেই ডেরা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করছি। এই কারণে একই ক্ষেতে ঘোরাঘুরি করে কখনও ডানে কখনও বামে যেতে হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমরা শুধু এক স্থানে দশ মিনিট বিশ্রাম করেই আমাদের সফর অব্যাহত রেখেছি। এখনও হনুমান গড়ের আধা কিলোমিটার পথ বাকি আছে। এরই মাঝে আরেকটি নদী পেলাম। আমরা সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং উত্তমরূপে স্নান করে শরীরের ধুলাবালি দূর করে নিলাম। আন্ডার ওয়ার ও গেঞ্জি খুলে সিভিলিয়ন পোশাক পরিধান করলাম। গাইড আমাদের জন্যে টিকেট কাটতে যেতে চাইল। আমি তাকে বাঁধা দিয়ে বললাম, টাকা তোমার কাছে রেখে দাও এবং অন্ধকার থাকতে থাকতেই গ্রামে ফিরে চলে যাও যেখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমি আমার রিভলবার লোড করে নিলাম। গাইডদ্বয় পিছনে ফিরে যেতে শুরু করল। আমি এক সাথীকে তাদের পিছনে পাঠিয়ে দিলাম দেখার জন্যে যে তারা বাস্তবেই ফিরে যাচ্ছে না কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। কেননা স্মাগলারদের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। অপরদিকে আমাদেরকে পৃথকভাবে হনুমানগড় থেকে ভন্ডার ট্রেনে সফর করতে হবে যা আজমীরগামী ট্রেনের পনের বিশ মিনিট পূর্বেই এসে যায় এবং পথের দিক থেকেও যা আজমীরগামী ট্রেনের ঠিক বিপরীত দিকের রাস্তা। আর এই কৌশল শুধুমাত্র ঐ দুই ব্যক্তিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। বলা তো যায় না মোনাফেকদের জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ...। আমি নিজের সাথীকেও রিভলবার লোড করতে বললাম যেন তারা যদি ঈষৎ এদিক সেদিক করার চেষ্টা করে তাহলে সাথে সাথেই গুলি করে। আনুমানিক বিশ মিনিট পর সাথী ফিরে আসল এবং বলল যে, হ্যাঁ; তারা সোজা রাস্তায় দৌড়ে পালাচ্ছে। এহেন মুহূর্তে দূর থেকে গাড়ির

হুইসেলের আওয়াজ ভেসে আসল। আমরা পুনরায় স্টেশনের পথে যাত্রা শুরু করলাম।

একদম ছোট একটি স্টেশন। সবেমাত্র আবছা আবছা পরিষ্কার হচ্ছে। আমরা চার সাথী স্টেশন থেকে কিছু দূরে ট্রেনের অপর প্রান্তে চলে গেলাম এবং পঞ্চম সাথীকে টিকেট কাটার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ট্রেন সম্ভবত এক দুই মিনিট দাঁড়ায়। সেখানে আমাদের সাথী টিকেট নিয়ে ট্রেনের অপর প্রান্ত থেকে আমাদের ইশারা করার সাথে সাথেই আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম। আমাদের সাথী দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে একজন একজন করে টিকেট সাথীদের হাতে দিয়ে দিল। আর আমরা চারজন অপরিচিতের মত একই বগিতে বসে পড়লাম। আনুমানিক পৌনে এক ঘণ্টা পরে ট্রেন গঙ্গা এসে থামল। গঙ্গানগর একটি বড় রেলস্টেশন। আমরা একজন একজন করে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম এবং স্টল থেকে চা নাস্তা খেয়ে নিলাম। তারপর দুইজন-দুইজন করে পৃথক পৃথক বগিতে বসে পড়লাম। এখন আমাদের মঞ্জিল বঠন্ডা জংশন। সেখান থেকে আমরা দিল্লিগামী গাড়িতে চড়ব। যদিও বঠন্ডা শহরটি তুলনামূলক একটি ছোট শহর, তথাপিও রেল জংশন-এর দিক থেকে এটির পশ্চিম ভারতের একটি বড় জংশন হিসেবে সুখ্যাতি রয়েছে। ট্রেন যখন বঠন্ডা এসে থামল আমরা এক একজন করে স্টেশনের বাইরে চলে আসলাম। আমরা মার্কেট থেকে সিগারেট ও সেভ করার জন্যে রেজার, ব্লেড ইত্যাদি খরিদ করি। এখন আমরা বর্ডার থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে যদিও আমাদের বর্ডার ক্রস করার টেনশন অনেকটা কমে গেছে কিন্তু সাথে করে আনা ওয়্যারলেস সেটই এখন আমাদের পেরেশানীর অন্যতম কারণ। আর আমাদের অন্যান্য সামগ্রীর সাথে যেহেতু ওয়্যারলেসও একই ব্যাগে ছিল সেহেতু ব্যাগ হেফাজতের যিম্মাদার ব্যাগ খোলার সময় প্রতিবারই ঘাবড়ে যায়। তাই ওয়্যারলেস রাখার জন্য পৃথক একটি ব্যাগ খরিদ করলাম এবং দিল্লী পর্যন্ত সফরের সময় সেই ব্যাগ সংরক্ষণের যিম্মাদারি আমাদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম।

শহরের একটি হোটেলে ঢুকে খাওয়া দাওয়ার পর্ব সেরে নিলাম। ওয়েটিং রুমে অমরা সেভ করে ভালভাবে গোসল করে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিয়ে পরস্পর পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিই যে, কোন এক্সপ্রেস বা পাঞ্জাব মেইলের পরিবর্তে ফাস্ট পেসেঞ্জারে আমরা দিল্লী পর্যন্ত সফর করব। তাহলে বিভিন্ন স্টেশনে বিরতিকালে যথাসম্ভব সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। আমরা সেকেন্ড ক্লাসের টিকেট কাটলাম। আমরা একটি বগি নির্দিষ্ট

করে সেখানে উঠে বসলাম। ট্রেন দুপুর তিনটায় দিল্লীর উদ্দেশে ছেড়ে গেল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ওয়্যারলেস সেট বিশিষ্ট ব্যাগ উপরের তাকে রাখা হবে এবং যখন যার পালা আসবে সে তার উপর মাথা রেখে ঘুমানোর ভান করবে। পেসেঞ্জার ট্রেন হওয়ার সুবাদে শিখ যাত্রীদের আধিক্য ছিল। একটি আশ্চর্যের ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, শিখ যাত্রীরাও চুপচাপ এবং তাদের চোখেমুখে নিরাশার ছাপ প্রস্ফুটিত। শিখ সম্প্রদায়ের চিরাচরিত নিয়ম যে, যেখানেই দুই শিখ একত্র হবে সেখানে অট্টহাসি উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলা একটি আবশ্যকীয় ব্যাপার। উপলব্ধি করলাম যে, ভারতের পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় তাদের আযাদীর মঞ্জিল '৭১-এর যুদ্ধের সাথে স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তারপর আবার তারা আমাদেরকে হিন্দু মনে করে সতর্কতা অবলম্বন ও ঘৃণা করছিল। আমি তাদের সাথে দু'তিনবারই কথা বলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই তাদের কাছ থেকে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়েছি।

আমরা বঠন্ডা থেকে সরাসরি দিল্লী যাওয়ার জন্যে প্রথমে জালন্ধর অতঃপর দিল্লী যাত্রাকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। কেননা আমাদের সফরের মাঝেই জালন্ধর, লুঁধিয়ানা ও আম্বালা নামক বড় বড় তিনটি সেনা ছাউনি পড়বে। ইতিমধ্যে আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, সেই ছাউনির নিকটতম স্টেশনগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি চলছে। দিল্লী থেকে অমৃতসরগামী ট্রেনে ভারতের এফ.আই.ইউ ফিল্ড ইন্টিলিজেন্স ইউনিট-এর সদস্যরা যাত্রীদেরকে চেক করতে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ আটককৃত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ভারতের পাও ক্যাম্প থেকে পলায়নের ভুরি ভুরি ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী যোদ্ধাদের শত শত নয় বরং হাজার হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ বর্জন করে। তাদের মধ্য থেকে কিছু বার্মার দিকে এবং বেশিরভাগ ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে লুকিয়ে লুকিয়ে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বর্ডারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐ সমস্ত সৈনিকদের ধরার জন্যে ভারতের পাঞ্জাবে অমৃতসরগামী ট্রেনগুলোতে চেকিং চলছে। বঠন্ডা থেকে দিল্লী সফরের মধ্যখানেই আমরা আরো তিনটি স্পেশাল ট্রেন দেখতে পেলাম। একটি ট্রেন বঠন্ডা ষ্টেশনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আর দুটি ট্রেনে ফ্রান্স নির্মিত অসি-১৩ এবং রাশিয়ান পি.টি-৭৬ ট্যাংক ও দূর পাল্লার তোপ কামান (হুটিয়ার) এবং ক্যাট টাইগার মিজাইলের বহর দেখা যাচ্ছে। রেল জংশনগুলোতে এই ট্রেনগুলোর ক্রসিংয়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। সীমান্ত অভিমুখে বিশাল সমরাভিযানের দৃশ্য ভারত পাকিস্তানের উপর

সামরিক প্রভাব বৃদ্ধি করছে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে সৈন্য হটিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে একত্র করছে। রুশ নির্মিত পি.টি-৭৬ ট্যাংক অর্থাৎ পানিতে চলমান ট্যাংক গুলি বিনিময় বন্ধ হওয়ার পর এই বিশেষ ট্যাংক পাকিস্তান সীমান্তে আনার দ্বারা ভারতের চিন্তাধারা অনেকটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। শুধু অর্ধ বেলাতেই আমরা চারটি সৈনিক ট্রেন দেখতে পেলাম। আমি এই ট্রেন ও কার্গোসমূহকে অতিক্রম করার দৃশ্য হৃদয়পটে খুব ভালভাবে ধারণ করলাম। যেন আমার প্রথম রিপোর্টে তার উল্লেখ করতে পারি। রাত আনুমানিক সাড়ে ন'টায় ট্রেন শাহেদরাহ স্টেশনে থামল। আমরা স্টেশন থেকে বের হয়ে দুটি টেক্সি নিয়ে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলাম। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবজীমন্ডি স্টেশনের নিকটবর্তী ঘণ্টাঘর চকে আমরা সাধারণ দুটি হোটেলে অবস্থান নিলাম। ভারতে পরিচয়পত্রের প্রচলন ছিল না বলেই হোটেলে রুম নেয়ার সময় কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। হোটেলে আমরা নিজেদেরকে সাধারণ কারবারী হিসাবে পরিচয় দিলাম এবং বললাম, নিকটবর্তী একটি ছোট শহর থেকে মাল খরিদ করার জন্যই এসেছি। বর্ডার ক্রসের টেনশন ইতিমধ্যে কেটে গেছে। তাই আমি আমার সাথীদেরকে দু'জন দু'জন করে দিল্লীতে ঘুরাফেরা করার অনুমতি দিয়েছি। আমরা হোটেলের প্রবেশ পথ ছাড়াও একটি বিকল্প পথের সন্ধান করে রেখেছি যেন জরুরী মুহূর্তে ব্যবহার করা যায়। আমরা হোটেলের দ্বিতীয় তলায় অবস্থান নিয়েছি। যাতে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এক তলা থেকে লাফ দিয়েও নেমে আসা যায়। সাথীরা সকালে ঘুরাফেরা করার জন্যে বাইরে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে বলে দিলাম যে, তারা যেন কমপক্ষে চার সেট রেডিমেট পাতলা জামা ও জুতাসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে নেয়। তারা সন্ধ্যার পূর্বেই তা খরিদ করে নিল। কিন্তু বিপাকে পড়লাম আমি। অধিক লম্বা হওয়ার কারণে আমার জন্যে কোন রেডিমেট কাপড় পেলাম না। শুধু একটি সাফারী স্যুট আমার সাইজে পেলাম। শেষ অবধি চারটি থ্রী পিস স্যুট ও একটি ডিনার স্যুটের কাপড় এবং জামার জন্য কাপড় খরিদ করে সেই দোকানেই আর্জেন্ট সেলাইয়ের অর্ডার দিলাম। আমার পায়ের সাইজ মিলিয়ে জুতা পেলাম অনেক কষ্টের পর। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতমানের হোটেলে অবস্থান করা এবং বিভিন্ন ক্লাবে বিশেষ করে জিমখানা এবং সার্ভিস ক্লাবে যেতে হবে বিধায় সেখানকার পরিবেশ অনুপাতে আমাকে পোশাক খরিদ করতে হবে।

আমরা দুইদিন দিল্লীতে ঘুরে ফিরে কাটালাম। নতুন ও পুরাতন দিল্লীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আমাদের সাথীদের পুরাতন

দিল্লীতে আর আমাকে নতুন দিল্লীতে অবস্থান করতে হবে। ইতিমধ্যে আমি পাকিস্তান থেকে আগন্তুক কন্ট্রাকটরের সাথে সাক্ষাতের স্থানটি আগেই দেখে নিলাম এবং সেখান থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন রাস্তাও অন্তঃস্থ করে ফেললাম। দু'দিন পর আমি সাথীদেরকে করোনেশন হোটেলে চেকইন হতে বললাম। নিজে লুধি হোটেলের দিকে রুখ করলাম। এই ফোর স্টার হোটেল পাকিস্তান থেকেই আমাদের অবস্থানের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে। নতুন দিল্লীতে এই হোটেলের নিকটেই ফাইভ স্টার অশোক এবং আকবর হোটেল অবস্থিত। ভারতের সেনা বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার এই এলাকাতেই অবস্থিত। আমরা পাকিস্তানী দূতাবাসের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করতাম। এক সময় পাকিস্তানী দূতাবাস ইসলামি আদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন হিন্দুরা যাকে ধ্বংসলীলায় পরিণত করেছে। দূতাবাস বন্ধ। এখানে একজন পুলিশ নামমাত্র পাহারা দিচ্ছে। আমরা সেই কন্ট্রাকটরের অপেক্ষায় ছিলাম যার সাথে আমাদের যাত্রার দশম দিনে সাক্ষাতের কথা ছিল। আমরা কিছু হোমওয়ার্ক তৈরি করেছিলাম। আমি দুইজন সাথীকে ঝান্সি পাঠিয়েছি। ঝান্সি স্টেশনের পরবর্তী স্টেশন হল বাবিনা। এই দুই স্টেশনের মধ্যেই ভারতের ফরেষ্ট আর্মড কোরের এক ট্যাংক ডিভিশন এবং ১০নং আর্মড ব্রিগেড অবস্থান করছে। আমার সাথীদের দায়িত্ব ছিল যে, ঝান্সিতে কিছু উপযুক্ত হোটেলের খোঁজ নেওয়া এবং ঐ সমস্ত হোটেল থেকে হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার জন্য সহজ ও কিছু বিকল্প পথের সন্ধান নেয়া। ঝান্সির পুরাতন দুর্গ সৈন্যদের ব্যবহারাধীন ছিল। তাই এ সম্পর্কেও কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার যদি সম্ভব হয় তাহলে তারা তা উদ্ধার করবে। আর আমি স্বয়ং নেভাল এবং এয়ার হেড কোয়ার্টারে প্রবেশের পথ বের করার চেষ্টারত আছি। আমাদের এই হোমওয়ার্ক অবশ্যই কন্ট্রাকটর আসার পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এখন ভারতে আমাদের সহযোগী বন্ধুদের ঠিকানা তালাশ করতে হবে। যেন প্রয়োজনের সময় তাদের ঠিকানা তালাশে সময় ব্যয় না হয়। মোটকথা, দিল্লীতে দু'দিন অবস্থান করার পরই আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।

আমি সাথীদেরকে চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসতে বলেছিলাম এবং চতুর্থ দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের ফানাট সরকারের এক রেষ্টুরেন্টে একত্রিত হওয়ার কথা। আমার অধিকাংশ সময়ই অশোকা হোটেলে কাটছে। এখানে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই দেশী ও বিদেশী মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। গরমের কারণে এয়ার কন্ডিশন হোটেলে ক্রমাগত মানুষের সমাগম বৃদ্ধি

পেতে আরম্ভ করেছে। আর আমিও এ সমস্ত মানুষ হতে নিজের মনের মানুষটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আর এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অবস্থায় আমি যে পন্থা অবলম্বন করছি তা হলো, সম্ভ্রান্ত সোসাইটির কারো সাথে এই হোটেলে চোখ বুঁজে হোঁচট খাওয়া এবং 'আই অ্যাম সরি' বলে তার পরিচয় জানা। অতঃপর তার সাথে বন্ধুত্বতার চেষ্টা করা। এখানে এভাবে সামাজিকতা সৃষ্টি করা একটি স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষ করে যখন কেউ মাতাল থাকে। তখন এক আধ ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে অপরিচিত মানুষও ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে আমি নিজেকে একজন চা ব্যবসায়ী হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলাম। কলকাতা থেকে চা নিয়ে এসে হোটেলে বসে তা মিক্স করতাম এবং নিজ কোম্পানীর নামে তৈরি করা প্যাকেটে ভরে তা ডিলারদের কাছে বিক্রি করতাম। চা ব্লেন্ডিং-এর উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন কোয়ালিটির চায়ের মাঝে মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন কোয়ালিটির চা তৈরি করা। লিপটন, ব্রুক ব্যান্ড ও ইস্পাহানী চা এমনিভাবে ব্লেন্ডিং করেই তৈরি করা হয়ে থাকে। দার্জিলিং চা ও নিজপিকু চা বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এখানে আমি চা নিজ কোম্পানীর নামে প্রস্তুত করে তা অর্ধমূল্যে সেনা ছাউনিতে সাপ্লাই করব। ছাউনিতে সাধারণত সেনা সদস্য ও Nco's এর জন্যে লঙ্গরখানার খোলা বাজারের চাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমার টার্গেট এই চা সাপ্লাইয়ের অজুহাতে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে এমনকি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌছে যাওয়া।

আমি অশোকা ও আকবর হোটেলে এমন কিছু সুযোগের সন্ধানে আছি যাতে করে উচ্চপদস্থ সেনা উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাক্ষাত সম্ভব হয়। যার বিনিময়ে সহজেই সেনা ছাউনিতে চায়ের অর্ডার অর্জন করতে পারি। এ উচ্চ সোসাইটিতে উচ্চপদস্থ অফিসার হওয়া পর্যন্ত স্বামীদের অন্তরে সহধর্মিনীদের কল্পনায় টইটম্বুর থাকে। স্ত্রীরাও স্বামীর পড়ন্ত যৌবনের মধু আহরণে ব্যাকুল হয়ে থাকে। হিন্দু অভিজাত সমাজ বিশেষ করে সেনা বাহিনীতে পাশ্চাত্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল যা ইতিমধ্যেই আমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। বেশির ভাগ সময় তারা হোটেলে জোড়ায় জোড়ায় আসত, কিন্তু যাওয়ার সময় যেত পৃথক পৃথকভাবে। তাদের এই দুর্বলতা আমার মনে নতুন কৌশল রেখাপাত করল। ইতিমধ্যে আমার চার সাথী ফিরে এসেছে। তারা প্রত্যেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে। আগ্রার ছাউনি শূন্য পড়ে আছে। ছাউনির সেনারা বেশির ভাগই পাকিস্তানের সীমান্তে গিয়েছে। জাট রেজিমেন্ট এবং শিখ রেজিমেন্টের দুটি বেটালিয়ান আছে ছাউনিতে, অপরদিকে ঝান্সি এবং

বাবিনার মাঝখানে আর্মড ডিভিশন এলাকায় কোন সিভিলিয়ান প্রবেশ করা যথেষ্ট বিপজ্জনক– এই মর্মে সংবাদ নিয়ে এসেছে অপর দু'সাথী। পর্যাপ্ত তত্ত্ব তালাশের পরই কাউকে সে এলাকাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। ঝান্সি দুর্গে এমুনিশন ডিপু ছিল। সেখানে রয়েছে দুর্ভেদ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থা। একটি চিন্তা আমার মস্তিষ্কে আঘাত হানল যে, আমরা ফিল্ম দেখতে অথবা শুধু ভ্রমণের জন্যে শত্রুদেশে আসিনি। মিশন সফলতার পথে যত প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন তা ছিন্ন করেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। তাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলাম। আমরা কন্ট্রাক্টরের অপেক্ষায় ছিলাম বিধায় নির্ধারিত তারিখের রাতে নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম। আমাকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি করা হয়েছিল যে, কন্ট্রাক্টরের সাথে শুধু আমি একাই সাক্ষাৎ করব। যদি কন্ট্রাক্টর না আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উধাও হয়ে যাব। ঠিক এক সপ্তাহ পর একই স্থানে একই সময়ে ১০ মিনিট পূর্বেই সেই জায়গার নিকটে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা ছিল বেশ জনবহুল। তারপর নিকটতম এক বুকস্টলে বিভিন্ন বই দেখতে লাগলাম। নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট পূর্বেই আমি কন্ট্রাক্টরকে দেখতে পেলাম। আমরা একে অপরকে চেনার জন্য এবং ভাল-মন্দ যাচাইয়ের জন্য পোশাকের উপর বিশেষ কালারের রুমাল লাগিয়ে ছিলাম। চেকিংয়ের জন্যে পরস্পর চোখাচোখি হওয়ার পরই আমি বাম বাহুকে বিশেষ এক ভঙ্গিতে নাড়া দিলাম। প্রতি উত্তরে কন্ট্রাক্টরও এমন বিশেষ ভঙ্গি করল। উভয়দিক থেকে সম্মতিসূচক আচরণের উদ্দেশ্য ছিল যে সবকিছু ভাল। পক্ষান্তরে বিপদজনক অবস্থায় পরস্পর রুমাল হাতে ধরা ও অন্য ধরনের শারীরিক কসরত করা ছিল সংকেত। যাই হোক, আমি একটি বই ক্রয় করে ফিরে চললাম। কন্ট্রাক্টর আমার থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে রয়েছে। সামনে কয়েকটি ফলের দোকান। আমি বিভিন্ন ফল দেখতে ও দাম দর করতে লাগলাম। কন্ট্রাক্টর একেবারে আমার গা ঘেঁষেই দাঁড়ালো এবং সেও ফলের দাম জিজ্ঞাসা করল। আমি কাপড়ের একটি ব্যাগ সাথে করে নিয়েছিলাম। আমি দুই কেজি আম খরিদ করলাম। দোকানদার কাগজের প্যাকেটে আম ভরে দিল। আমি তা ব্যাগে ভরে নিলাম। আমি বাম হাতে ব্যাগ ধরেছিলাম। আর কন্ট্রাক্টর আমার বাম পাশে দাঁড়ানো ছিল। আমি দোকানদারকে লিচু দেখাতে বললাম। দোকানদার যখনি লিচু দেখাতে ঘুরে গেল, কন্ট্রাক্টর খুব দ্রুত সতর্কাবস্থায় একটি প্যাকেট আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল। আমি কিছু লিচু নিয়ে তার দাম দিয়ে ফিরে চললাম। কন্ট্রাক্টরও হয়তো আমার যাওয়ার পর কিছু ফল ক্রয়

করে থাকবে। আমি নিকটেই এক টেম্পুতে উঠে পড়লাম। কিছুদূর যাওয়ার পর টেম্পু ছেড়ে দিলাম। তারপর বাসে উঠলাম। তারপর বাস ছেড়ে আবার টেম্পুতে উঠলাম এবং নিজ আবাসস্থল পৌঁছতে পৌঁছতে আমি আনুমানিক তিনগুণের অধিক পথ সফর করলাম। এজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যে, যদি কেউ আমার পিছু নিয়ে থাকে তাহলে সে ভড়কে যাবে।

হোটেলে পৌঁছার পর ভালভাবে দরজা লাগিয়ে প্যাকেট খুললাম। প্যাকেটে আরও দশ হাজার ভারতীয় রূপী আর পাঁচ পৃষ্ঠার একটি চিঠি ছিল। এটি হিন্দি ভাষায় লেখা একটি প্রেমপত্র। যে কেউ তা দেখলে হয়ত ধারণা করবে, আমি এক রসিক প্রেমিক। চিঠিগুলোতে ব্যবহৃত প্রতিটি কাগজের অপর পৃষ্ঠা ছিল খালি। আমি সংকেত বুঝতে পেরে মোমবাতি জ্বালিয়ে চিঠির সাদা দিককে মোমবাতিতে সেঁকে গরম করতে লাগলাম। সাদা কাগজের পিঠে ধীরে ধীরে সোনালী রংয়ের অক্ষর ভাসতে শুরু করল। মাত্র ১৫ মিনিটেই সমস্ত পৃষ্ঠার গোপন কালিতে লিখিত কথাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এই পাঁচপৃষ্ঠা আমাদের পাঁচজনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এতে আছে, ভালভাবে আমাদের সীমান্ত পাড়ি দেয়া ও সহিহ-সালামতে দিল্লী পৌঁছার মোবারকবাদ ও সাহস বৃদ্ধির জন্যে অভয়বাণী। তাছাড়া এ পত্রে আমাকে নতুন করে একটি মিশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ নতুন মিশনকে অন্যসব কাজের উপর প্রাধান্য দিয়ে দ্রুতগতিতে স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করার তাগিদও করা হয়েছে। তার সাথে ডাক পাওয়ার রসিদ ও বর্তমান অবস্থা জরিপ করে কাজের বিবরণ লিখতে বলা হয়েছে।

আমি উত্তর লেখার জন্য পূর্ব থেকেই গোপন কালি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। সেই কালিতে দুই পৃষ্ঠা উত্তরপত্র লিখলাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অপর পিঠে ইংরেজি কবিতার কিছু অংশ লিখতেও ভুল করলাম না। চিঠিপত্রে আমরা যে গোপন কালি ব্যবহার করছি তা হচ্ছে পিঁয়াজ, রসুন ও লেবুর রস। এই রস দ্বারা পত্র লিখে কাগজ শুকানোর পর লেখার কোন চিহ্নই বাকী থাকে না, একদম পরিষ্কার দেখা যায়। আবার যখনই এ কাগজকে গরম করা হবে তখনই লেখাগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আগামীকাল আমাকে নতুন এক জায়গায় কন্ট্রাক্টরের সাথে ঠিক দশটায় সাক্ষাত করতে হবে এবং উত্তরপত্র তার হাতে হস্তান্তর করতে হবে। সময় ও স্থান পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। তাই প্রোগ্রাম অনুযায়ী ঠিক দশটায় আমরা নির্ধারিত জায়গায় মিলিত হলাম। আমি উত্তরপত্রের প্যাকেট তার হাতে হস্তান্তর করলাম। কন্ট্রাক্টর ফিরে যাওয়ার পর সাথীদের চিঠি হাতে দিলাম।

ভারত আসার পর জন্মভূমির সাথে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম যোগাযোগ। এ যোগাযোগে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হলাম। এ যোগাযোগ আমাদের ঝিমিয়ে পড়া অঙ্গগুলোকে সতেজ করে দিল। দূর করে দিল মনের সকল অবসাদ ও ক্লান্তি। ভুলে গেলাম প্রবাসের সকল দুঃখ, ফিরে পেলাম উদ্যমতা। তাছাড়া পত্রে অভয়বাণী থাকায় আমাদের চেতনা সাগরে জোয়ার উঠল। তাই আমরা এ জোয়ার ধরে রাখার জন্য এবং মিশনকে সফল করার জন্যে নতুনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম। তারপর আমি হোটেলে ফিরে আসলাম এবং নতুন মিশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। লিপটন, গ্রীণ ল্যাবেল এবং ব্রুকব্যান্ড রেড লেবেলের প্রতিটি থেকে ছয়টি করে টিন নিয়ে রাতে তা ব্লান্ডিং করলাম। তারপর আধা কিলো করে প্যাকেট করলাম। প্যাকেট করা শেষ হলে নতুন মিশনের কলা-কৌশল নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম যে, কিভাবে এই কঠিন কাজ সম্পাদন করব। এতে কোন সমস্যা হবে কিনা, হলে তার সমাধান কিভাবে করব। এই ভাবনাতেই রাতের আঁধার চিরে পুবাকাশে দিনের আগমনি বার্তা জানিয়ে উদিত হল টকটকে লাল সূর্য। সকাল বেলা সাথীদেরকে বিদায় দিয়ে দিলাম। বিদায়বেলা ট্রান্সমিটারটিও দিয়ে দিলাম যা আগ্রা ও ঝান্সি যাওয়ার সময় তাদের থেকে রেখেছিলাম।

সাথীদেরকে বিদায় জানানোর পর আমি হোটেলে এসে নিদ্রাপুরীতে পাড়ি জমালাম। কেননা নতুন মিশনের কাজে আগামীকাল প্রত্যুষে আমাকে দিল্লীর বাইরে যেতে হবে। আমার এ অনুপস্থিতিতে ট্রান্সমিটারধারী সাথীকে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তারা চারজন বিভিন্ন হোটেলে থাকত। আমি তাদেরকে কারোনিশে বদলী করে দিলাম। সাথে সাথে হোটেলের বাইরে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতিও দিয়ে দিলাম। এদিকে কন্ট্রাক্টরের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং বারদিন পর নতুন জায়গায় দুপুরের পর সাক্ষাত করতে বললাম। এই বারদিন সময় এজন্য নিলাম যেন এই বারদিন রাত-দিন ঐকান্তিক পরিশ্রম করে আমার দায়িত্বের বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে কন্ট্রাক্টরের হাতে পাঠিয়ে দিতে পারি।

পাকিস্তান থেকে যাত্রার প্রাক্কালে আমাকে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। আমি তাতে কিছু রদবদল করেছি। আর রদবদলের কারণ হচ্ছে, পাকিস্তানে বসে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঠিক অনুমান করা সম্ভব না। আমি ভারত ঘুরে ফিরে ভারতের অবস্থা দেখে উপদেশাবলীতে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছি। এ পরিবর্তন শুধুমাত্র ভারতে বসবাস ও বর্ডার গাইডকে ফেরত পাঠানো পর্যন্তই সীমিত। কেননা বর্ডার অতিক্রম করার পর মিশনের

কামিয়াবী ও সাথীদের যথাযথ সংরক্ষণ করা আমার যিম্মায়। আমার মিশনের কর্মসূচীর একটি হচ্ছে আহমদ নগর যাওয়া। পাকিস্তান ব্রিফিংকালে বলা হয়েছে যে, আহমদ নগর হচ্ছে ভারতের আর্মড কোর অর্থাৎ ট্যাংক ট্রেনিং সেন্টারে আর্মড কোরের যুবকদেরকে শুধুমাত্র বর্তমান বিদ্যমান ট্যাংক গান চালানোর প্রশিক্ষণই দেয়া হয় না বরং রাশিয়া থেকে আমদানীকৃত টি-সিরিজ ট্যাংকের ব্যবহার পদ্ধতিও শিখানো হয়। আনন্দ ফুর্তিতে গুলিবর্ষণকারী কখনো দক্ষ গোলন্দাজ হতে পারে না। যুদ্ধের সময় সম্মুখ থেকে আসা হাজার হাজার, লাখ লাখ, গুলা বৃষ্টি, বোম, অশ্বের পদাঘাতে উড়ন্ত ধুলা-বালি, ধোঁয়া একাধারে রাতদিন ২৪ ঘণ্টা কাদা পানি ও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে যে অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার করতে পারে এবং এ কঠিন পরিস্থিতিতে অস্ত্র খুলে ময়লা পরিষ্কার করে তা আবার যথাস্থানে ফিট করে নিশানা ঠিক করতে পারে সেই হচ্ছে দক্ষ গোলন্দাজ। এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করব না যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী যদিও প্রশিক্ষণের দিক থেকে আমাদের চেয়ে উত্তম নয় তবে আমাদের চেয়ে কোন অংশে কমও নয়। এশিয়া মহাদেশে মুসলমানদের হাজার বছরের শাসন তাদেরকে কাপুরুষে পরিণত করে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক পাক বাহিনীর কাছে ভারত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। তবে ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে দুই টুকরা করে দিয়ে এবং ৯০ হাজার পাক বাহিনীকে বন্দি করে তার মৃতপ্রায় বদনে নব জীবন ফিরে পেয়েছে।

আহমদ নগরে আমার কাজ হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে নতুন আমদানীকৃত ট্যাংক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। আর্মড কোরের কোন কোন রেজিমেন্ট এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তা জানা। এর সাথে এও জানা যে, ট্রেনিং শেষ করে এই রেজিমেন্ট কোথায় যাবে এবং কোন ইনফেন্ট্রি-এর সাথে তাদেরকে মিলানো হবে। আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, আমার কষ্টার্জিত এই তথ্য পাকিস্তানের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কাছে 'সাখতাও জিনত' নামের ট্যাংক আছে, যা অনেক ভারী ও ধীরগতির। ১৯৬৫ সালে ভারতের কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল চৌধুরীর এ ট্যাংকের প্রতি সীমাহীন অহংকার ছিল। তিনি এই ট্যাংককে 'কাল হাতী' নাম দিয়েছিলেন। দেখতে এটা পাহাড়ের মত। তাছাড়া এই ট্যাংককে বসা হাঁসের মত মনে হতো। ভারতের কাছে এছাড়া ফ্রান্স নির্মিত এ.এম.এক্স-১৩ রাশিয়ান পি.টি-৭৬ ও টি.সিরিজ-এর মত এ যুগের সর্বোত্তম ট্যাংকও রয়েছে। ট্রেনিংয়ের পর এই ট্যাংক রেজিমেন্টকে পাক-ভারত সীমান্তে নিয়োগ করা হবে। ভারতের কাছে

রক্ষিত ট্যাংকের কর্মক্ষমতা ও সীমান্তে নিয়োজিত বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া পাকিস্তানের একান্ত অপরিহার্য। পাকিস্তান যদি ভারতের টি-৫৭ ট্যাংকের সামনে পাকিস্তানের যুদ্ধবিধ্বস্ত পুরাতন ট্যাংক রাখে তবে তা হবে নিজেদের জীবন ও ট্যাংক নিজ হাতে ধ্বংস করা। এ ধ্বংসের কবল হতে বাঁচতে হলে টি-৫৭-এর মোকাবেলায় পাকিস্তানকে আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত এম.সিরিজ-এর নতুন ট্যাংক এবং পিটন ট্যাংক দাঁড় করাতে হবে। এ কারণেই আমাকে তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

আহমদ নগর বোম্বাই শহর থেকে আনুমানিক পাঁচশত কিলোমিটার পূর্বে শহরের কোলাহল মুক্ত গুদওয়ারী সমুদ্রের তীরবর্তী নির্জন এলাকায় অবস্থিত। তার আশেপাশে কোন মিল ফ্যাক্টরি নেই। গুদওয়ারী সমুদ্রের একটি নদী আহমদ নগরের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হয়ে গেছে। মোটকথা, আহমদ নগর ট্যাংক ট্রেনিংয়ের জন্য খুবই উপযোগী। এখানে উঁচু-নিচু, কাদা-বালি ও পানি থাকাতে ট্যাংকের ব্যবহারে যাবতীয় ট্রেনিং দেওয়া হয়। আনুমানিক বিশ বাইশ ঘণ্টার দীর্ঘ সফরের পর আমি আহমদ নগরে পৌঁছলাম। এ শহরের নামী দামী পছন্দনীয় একটি হোটেলে উঠলাম। এখন কাজ হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করা যেখানে রয়েছে ব্রিগেডিয়ার হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশন হেড কোয়ার্টার। ট্রেনিং সেন্টার এলাকায় প্রবেশ করা দুরূহ ব্যাপার হলেও সম্ভব। আমি ব্রিগেডিয়ার হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করার জন্য চা বিক্রেতার ছদ্মবেশ ধরলাম এবং এই বেশে উভয় স্থানের প্রধান ব্যক্তি জেড,আই,সি ও এ,ডি,ও,এস পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলাম। তাদের কাছে লঙ্গরখানার জন্য আমার বয়ে আনা চা পেশ করে বললাম, স্যার! আমার চা হচ্ছে বর্তমান বাজারের সেরা চা। এটা শুধু নামে নয়, কাজেও সবার শীর্ষে। যে এই চা একবার পান করেছে সে বারবার পান করতে চাইবে। বোম্বাই নিউটাগে হচ্ছে আমার হেড অফিস। আর আমি বর্তমানে আহমদ নগরের অমুক হোটেলে আছি। এই প্যাকেটগুলো স্যামপল হিসাবে রেখে যাচ্ছি। আগামীকাল এসে জানব যে, আমার চা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার চায়ের উত্তম কোয়ালিটি ও স্বল্প মূল্যই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার সময় আমি ডিভিশন ও রেজিমেন্ট-এর প্রতীক শনাক্ত করে ফেলেছি। এখন আমার টার্গেট হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য সংগ্রহ

করা। এই উদ্দেশ্যেই সন্ধ্যা বেলা ঘুরাফেরা করার জন্যে হোটেল থেকে বের হয়ে গেলাম। বাইরে এসে একটি অটোরিক্সা ভাড়া করলাম। ড্রাইভারকে সমগ্র শহর ঘুরিয়ে দেখাতে বললাম। আমরা ঘুরতে ঘুরতে শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। এখানে এসে দেখলাম যে, সেনা ছাউনির বাইরে একটি শরাবখানা। প্রশিক্ষণার্থী সেনা সদস্যরা এ শরাবখানায় প্রবেশ করছে এবং শরাব পানাহারান্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং গ্রহণকালে যেহেতু ভারতের সকল রেজিমেন্টের প্রতীকসমূহের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম সেহেতু সেনা সদস্যদের দেখামাত্র চিনতে আর দেরি হল না যে, এরা কে কোন রেজিমেন্টের সদস্য। তাদের প্রতীকই বলে দিচ্ছে যে, তারা বিভিন্ন রেজিমেন্টের সদস্য। তারা এ শরাবখানায় তাদের চাহিদা পূরণের জন্য আসে। ভারত সরকার সেনা সদস্যদেরকে প্রতিদিন দুই আউন্স করে শরাব ফ্রি দেয়। আর এই দুই আউন্সে তাদের চাহিদা মিটে না। যার জন্য তারা এই শরাবখানায় আসতে বাধ্য। কেননা, এখানে দেশীয় শরাব পাওয়া যায়। আর তারা এই শরাব পান করেই বাকী চাহিদা পূরণ করে। আমি শরাবে মাতাল সৈন্যদের থেকেই আমার কাঙ্ক্ষিত তথ্য উদ্ধারের পরিকল্পনা করে হোটেলে ফিরে আসলাম।

আমি পরদিন পুনরায় আই,ডি ও আই,সি অফিসে গেলাম এবং আমার চায়ের স্যামপলগুলোকে অফিসেই পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি অফিস কর্মকর্তাদের কাছে আমার চায়ের ব্যাপারে জানতে চাইলাম যে, আমার চা কি এখানে চলবে? আমার চা কি নিবেন? জবাবে তারা বলল যে, আমরা এক সপ্তাহ পর আপনাকে জানাব, আপনার চা আমরা নিব কি না। যদি আপনার চা আমরা নিই তবে আপনি যে সর্বদা আমাদের চাহিদা মাফিক চা সরবরাহ করতে পারবেন তার জামানত হিসাবে এডভান্স জমা করতে হবে। তারপর আমরা আপনার সাথে নিয়মানুযায়ী এগ্রিমেন্ট করব এবং এ এগ্রিমেন্টেই লেখা থাকবে যে, আপনি কত তারিখ থেকে চা সরবরাহ শুরু করবেন। এ জবাব শুনে আমি অফিস থেকে বেরিয়ে হোটেলের পথ ধরলাম। তাছাড়া অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে, আমার চা এখানে চালাতে হলে ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের এ.ডি.ও.এস এবং ব্রিগেডিয়ার হেড কোয়ার্টারের ২-কে ও এড জয়েন্টের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। আর বন্ধুত্বের জন্য তাদেরকে বখশিস দিতে হবে।

# ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে ফাটল

আমি আই,ডি,ইউ-এর দপ্তরের এক প্রবীণ চৌকস করণিককে সন্ধ্যাবেলা আমার হোটেলে কিছু সময় গল্প করার জন্য দাওয়াত দিলাম। কিন্তু সে হোটেলে আসতে ওজর পেশ করল। কারণ, শহরে কয়েকটি পতিতালয় থাকায় কিছু কিছু হোটেল এলাকা সেনাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এফ.আই.ইউ-এর মিলিটারী পুলিশ সেনাদেরকে সেই নিষিদ্ধ এলাকা থেকে গ্রেফতারের জন্য ঘুরাফেরা করে। তাছাড়া একজন করণিককে শহরের এক হোটেলে একজন অপরিচিত সিভিলিয়ানের সাথে দেখে সন্দেহ করতে পারে। তাই আমি তাকে ছাউনির বাইরে কোন এক শরাবখানায় সাক্ষাতের কথা বললাম। এতে সে সম্মতি প্রকাশ করল এবং আমাকে একটি শরাবখানার লোকেশন বুঝিয়ে সেখানে সন্ধ্যা আটটার সময় সাক্ষাত করতে বলল। তাকে দাওয়াত দেয়ার ফলে আমার একটি অভিসন্ধি সফল হল। আর তা হচ্ছে আমি শরাবখানায় অপরিচিত হিসাবে যাচ্ছি না বরং একজন সৈনিক আমার সাথে রয়েছে। একবার যদি সেখানে পরিচিত হতে পারি, তবে অন্যদের থেকে আমার কাঙ্ক্ষিত তথ্য বের করে আনতে তেমন কষ্টসাধ্য হবে না। সন্ধ্যা পৌনে আটটার পূর্বেই আমি সেখানে পৌছে গেলাম এবং বাইরে কিছুক্ষণ পায়চারী করলাম। তারপর দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, লোকটি পূর্ব থেকেই ভিতরে বসে আছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করে তার টেবিলে পৌছে গেলাম। সে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। সে কোন কিছু অর্ডার দেয়ার পূর্বেই আমি সেখানে প্রস্তুত সর্বোৎকৃষ্ট শরাবের পূর্ণ এক বোতলের অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণ সে লৌকিকতা করল কিন্তু আমি তাকে বললাম যে, আরে ভাই! তুমি একজন সীমিত বেতনভুক্ত সৈনিক, আর আমি একজন ব্যবসায়ী।

শরাব পানকালে তার দু'তিনজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত হলো। আমি তাদেরকেও আমাদের টেবিলে বসার দাওয়াত দিলাম। শরাব পান করার এই হলটিতে বিভিন্ন ট্যাংক রেজিমেন্টের তরুণ এবং এন.সি.ও উপস্থিত রয়েছে। তারা শোরগোলে মেতে আছে আর আমি এমন পরিবেশের অনুসন্ধানেই ছিলাম। আমি বিশেষভাবে সতর্ক ছিলাম বলে সেই রাতে এদিক সেদিক

আলোচনা ও হাসি-তামাশা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করলাম না। এই শরাবখানাটি এ এলাকার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা। প্রতিটি শরাবখানা রাত বারটার মধ্যে বন্ধ করা বাধ্যতামূলক ছিলো। আমি সবার পছন্দের খাবার অর্ডার দিলাম। আমরা যখন শেষ বৈঠক করলাম ততক্ষণে তিন বোতল শরাব শেষ হয়ে গেছে। দু-একটি রিকশা রাস্তায় তখনো চলছে। করণিক মাতাল অবস্থায় ছাউনির দিকে চলে গেল আর আমি একটি রিকশায় চড়ে হোটেলের পথ ধরলাম। সেখানকার পরিবেশ দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আগামীকাল থেকেই আমার কাজের সূচনা করব।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় আমি শরাবখানায় পৌঁছে গেলাম। ততক্ষণে আমিও শরাবখানার একজন বিশেষ গ্রাহকে পরিণত হয়ে গিয়েছি। গতরাতের বড় খরিদ্দার হওয়ার কারণে বেয়ারা হাসিমুখে কুশল বিনিময় করে আমাকে খালি একটি টেবিলে নিয়ে বসাল। তারপর সর্বোৎকৃষ্ট শরাবের এক বোতল নিয়ে আসল। কিছুক্ষণ পর আমি একটি গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালাম। টেবিলের পাশ দিয়ে হেলে দুলে যাওয়ার সময় গ্লাসটি একটি সৈনিকের গায়ে ঢেলে দিলাম। সে টেবিলে পাঁচজন সেনা বসা ছিলো। তারা আমার দিকে কটাক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করল। আমি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এতেই তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আমি বললাম যে, আমি ব্যবসার জন্য বোম্বাই থেকে এসেছি আপনাদের ছাউনিতে ADOS এর সাথে সাক্ষাত করতে। তাই আমি আপনাদের মেহমান, কিন্তু এখন আপনারা পাঁচজনই আমার মেহমান। মাতাল অবস্থাতেই আমি বেয়ারাকে আমার টেবিল থেকে আমার বোতলের পাশাপাশি আরো দুটো বোতল আনার কথা বললাম। সর্বত্র দেখা যায় নিম্নস্তরের সৈনিক ও তরুণগণ সাধারণত খুবই সীমিত চিন্তা চেতনার অধিকারী হয়ে থাকে। ADOS (যা লেফটেন্টের পদমর্যাদার হয়)-এর সাথে সম্পর্ক আছে এমন উচ্চপদস্থ ব্যবসায়ী ব্যক্তি যখন নিঃসংকোচে এসব সৈনিকের সাথে বসে পড়ে তখন তারা এমনিতেই ভদ্র বনে যায়। প্রথমদিকে তারা আমার মেহমান হতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু তারপরও আমি যখন সরলমনে তাদেরকে ভাই ভাই বলতে শুরু করলাম তখন তাদের সংশয় কেটে গেল এবং একটি বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, তারা আমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ শুরু করে দিল। আমি খুব সতর্কতার সাথে আমার কথাবার্তার মোড় আমার চায়ের কারবারে ও ভারতের চা পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের চা ভারতে কিভাবে পাচার হয়ে আসে তার দিকে ঘুরিয়ে

দিলাম। আমি তাদের বললাম যে, আমার বুঝে আসছে না আমাদের সেনাবাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ঢাকাতে কেন হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করালো। যদি তারা সে দেশটি দখল করে নিত তবে তো অখণ্ড ভারতের অর্ধেক স্বপ্নই সফল হয়ে যেত। সাথে সাথে আমাদের দেশের সীমান্তের পরিধিও বেড়ে যেত। আপনারা নব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে বন্দী করে এনেছেন। পাকিস্তান তাদেরকে ফেরত নেবে কিনা জানা নেই। ফেরত না নিলে তারা তো আপনাদের উপর খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির দিক দিয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আমার এই কথাগুলো শুনে তারা হেসে দিল। তাদের মধ্যে বোধসম্পন্ন সৈন্যটি বলতে শুরু করল, ভাই! আমরা লাভ বিনে ক্ষতিতে নেই। নব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের হাতে বন্দী। আর এ পরাজয়ে পাকিস্তানের কোমর ভেঙ্গে গেছে। অতি সত্বরই আপনারা দেখতে পাবেন পুরো পাকিস্তান আমাদের হাতে চলে এসেছে। আমি উজানালার অধিবাসী। সেনাবাহিনীতে নয় বছর ধরে ট্যাংক রেজিমেন্টে আছি। আমরা পেশোয়ারের আধিবাসী ছিলাম। আমার পূর্বপুরুষরা সৈনিক ছিলো। '৬৫ সালের যুদ্ধে তারা মৃত্যুবরণ করে। সে আরও জানাল যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চল জয় করা সহজতর। কারণ, পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে আফগানিস্তান আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র। কাশ্মীরের অর্ধেকের বেশি আমাদের দখলে আর এখানে আমরা ভাল পজিশনেই আছি। '৬৫ সালে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনেই যুদ্ধ করেছিলাম যে, আফগানিস্তানের আটক পর্যন্ত দখল করে আমাদের সীমান্ত বর্ডার প্রশস্ত করে গুজরানওয়ালা পর্যন্ত বিজয় নিশান উড়াব। এদিকে আমাদের সেনাবাহিনী কাশ্মীর থেকে গুজরাট, মীরপুর এবং মরীর রাস্তা অতিক্রম করে পুরো পাকিস্তান দখল করে নিবে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী একই সময়ে তিনটি যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে পারবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল সমুদ্র ও নদীমাতৃক এলাকা হওয়ায় লড়াই করে বিজয় অর্জন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া বার্মাও আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র নয় যে, তারা আমাদের বিপদের সময় সহযোগিতার হাত বাড়াবে। আমরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করিয়ে বন্দী করে আমাদের দেশে নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশের সাথে আমাদের সামরিক চুক্তি আছে যে, বিশ বছর পর্যন্ত তারা দুই ডিভিশনের অধিক সৈন্য রাখতে পারবে না। তাছাড়া সেখানে আমাদের কৃতজ্ঞতাতুষ্ট মুজিবের শাসন রয়েছে। এখন পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের সেনাবাহিনী আমাদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে শতবার চিন্তা-ভাবনা করবে যে, ভারতের হাতে তাদের নব্বই হাজার সৈন্য বন্দী রয়েছে।

অতএব, অতি সত্ত্বরই অমরা আপনাদেরকে উপহার দেব এক অভূতপূর্ব বিজয় বার্তা।

মদের নেশায় সে বাস্তবিকই প্রলাপ বকছে আর আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম যে, শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক বিদেশী মুসলিম সামরিক শক্তির বলে হাজার বছরের প্রাচীনতম এক শাসক জাতিকে হাজার বছর ধরে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো। আর আজ তাদের নিজেদের অদূরদর্শিতার কারণে একটিমাত্র পরাজয় হাজার বছরের বিজয়গাঁথা ও শাসক শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি মাটি করে দিয়েছে। উত্তেজনায় আমার রক্ত টগবগ করছে, মন চাচ্ছে বোতলটা ভেঙে ফেলতে এবং তা দিয়েই তাকে জাহান্নামে পাঠাতে কিন্তু সতর্কতা ও স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে আমি শুধু নীরবই থাকলাম না বরং তার উস্কানিমূলক কথাবার্তাতে আরও ইন্ধন যোগালাম। আলোচনার মোড় যুদ্ধের দিকে ঘুরে গেল। আর আমি এই মোক্ষম সুযোগটাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, বর্তমান বাংলাদেশ যা তোমাদের বীর পিতার কথানুযায়ী জয় করা দুষ্কর ছিলো তা তোমরা এত সহজেই কিভাবে জয় করলে? উত্তরে সে আমাকে বলল, যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মদ্যপ, ব্যভিচারী ও লম্পট হয় এবং যুদ্ধস্থলের কোর কমান্ডার যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে চিন্তা-ভাবনার স্থলে রাজধানী ঢাকার বিলাস বহুল হোটেলে অবস্থান করে, তন্বী তরুণী যুবতীদের সাথে জবরদস্তিমূলক যৌনাচার করে থাকে- যার ফলশ্রুতিতে দুই ডজনের অধিক যুবতী সম্মিলিতভাবে দু'তলার ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল, যে দেশে সুশাসনের নাম-নিশানাও নেই সেই দেশ পরাজিত হবে না তো কে হবে? সত্যিই সে একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। আমি তার আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করলাম। সে মাতাল হওয়ার কারণে এবং এক সিভিলিয়ানের পক্ষ হতে নিজের প্রশংসা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল যে, আমাদের সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল অস্ত্র সংগ্রহ করে তা পর্যাপ্ত তদন্তের পর অখণ্ড ভারত অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গ্রহণ করে। রাশিয়া আমাদের আসল বন্ধু। তারা যুদ্ধের পূর্বক্ষণে আমাদের সাথে সামরিক চুক্তি করে। তারা সবসময়ই ইউ.এন.ও-তে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য ভেটো দিয়ে আসছে। '৬২ সালে চীনের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুধুমাত্র একটি চাল বৈ অন্য কিছু ছিলো না। আর এ চাল এজন্যই করা হয়েছিল যে, আমেরিকার অস্ত্র বিনামূল্যে অর্জন করা। রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমরা একটিমাত্র দেশ থেকে অস্ত্র অর্জনে নির্ভরশীল হইনি। বরং আমরা ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়া

থেকেও অস্ত্র নিই। সে এও বলল যে, '৬৫ সনের যুদ্ধের পর রাশিয়া আমাদের মিসাইল বুট্‌স দিয়েছে যা আমরা লুফে নিয়েছি। একই মিসাইল বুট্‌স চীন পাকিস্তানকেও দিতে চেয়েছিল যা পাকিস্তান নৌবাহিনীর প্রধান শুধু এ কারণে গ্রহণ করেনি যে, তার মধ্যে অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের জন্য পৃথক অবস্থান কক্ষ নেই। রাশিয়ান এই মিসাইল বুটসের ফলেই পাকিস্তানের DISTROYER খায়বারকে কয়েক মুহূর্তে টুকরো টুকরো করা সম্ভব হয়। পাকিস্তান শুধুমাত্র আমেরিকার উপরই নির্ভরশীল যেখানে আমেরিকা নিজেই হচ্ছে আত্মসাৎকারী। আজ আমরা যেখানে সামরিক ইন্ডাস্ট্রি খুলেছি ও সমুদ্র জাহাজ, জঙ্গী বিমান এবং ট্যাংক পর্যন্ত প্রস্তুত করতে শুরু করেছি সেখানে পাকিস্তান একটি জীপও প্রস্তুত করতে পারেনি। তার এই কথাগুলো আমার অন্তরে খঞ্জরের ন্যায় বিঁধছে। তারপরও আমি চুপ রয়েছি। সেতো মদের নেশায় তাদের সাফল্যগাঁথা বলছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে আমাকে আয়না দেখাচ্ছে। আর আমি এ আয়না হুবহু আমার জাতিকেও দেখাতে চাই। আমরা যেমন আমাদের শত্রুও তেমন। তার প্রতিজ্ঞাও অভিন্নপন্থী এবং অগ্নি মিসাইল তার আক্রমণাত্মক সংকল্পের একটি চিত্র। আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত যে, অর্ধপাকিস্তানকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে রেখেছেন। অন্যথায় আমরাতো নিজেদেরকে ধ্বংস করার কাজে কোনদিকে ত্রুটি করিনি। আমি ডাঃ আবদুল কাদির খানের জন্য প্রাণভরে দোয়া করি। কেননা তিনি জীবন ব্যাজি রেখে স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন স্থাপন করেছেন এবং কোটি ডলারের উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তিধর একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে ভারত আজ দিশেহারা। অন্যথায় ভারত তো পাকিস্তানকে গিলেই ফেলত।

আমার পক্ষ থেকেও কিছু কথা না বলে পারছি না। আর তা হলো, পাকিস্তানের মত অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া প্রায় একটি রাষ্ট্রে দেদারছে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে যে বিলাসিতা করছে তার দায়ভার বহন করার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? আমাদের সরকার যেখানে বুলেট প্রুফ ৫৫০ মার্সিডিজ গাড়ি হাঁকায় সেখানে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী সাইকেলযোগে অফিসে যায় আর তার স্ত্রী লোকাল বাসে করে শপিংয়ে যায়। ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট হচীমোহ সাধারণ পোশাক পরে বিদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। তিনি নিজের বার্ষিক ভাতা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। শেষ পর্যন্ত তার জুতা কেনার মত পয়সাও

ছিলো না। আর তিনি থাকতেন রাষ্ট্রীয় ভবনের বাগানের এক কোণে একটি কুড়ে ঘর বানিয়ে।আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ ইরান আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আজ স্বাচ্ছন্দেই রয়েছে। আমি ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আকবর হাশেমী রাফসানজানীকে তেহরানের হামাশিরটন হোটেলের লবিতে দুই তিনজন সাথীকে নিয়ে Snacks খেতে দেখেছি। আমি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হলাম এই দেখে যে, না কোন পুলিশ হোটেল বেষ্টন করে রেখেছে না নিরাপত্তা প্রহরীদের কোন সদস্য সেখানে উপস্থিত আছে। হোটেলের বাইরে কালো রঙের একটি মার্সিডিজ-২০০ গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর ইরানের জাতীয় পতাকা উড়ছে। গাড়ির ভিতরে একজন ড্রাইভার ও ব্যক্তিগত সেক্রেটারী রয়েছে। তার হোটেলে আসার জন্য রোড ক্লিয়ার করার নামে ট্রাফিককে অসহনীয় যানজটের সৃষ্টি করতে হয়নি। বরং সাধারণ একজন নাগরিকের মত হোটেলে আসেন, খানা খান ও বিল পরিশোধ করে চলে যান। তেহরানে কয়েকটি শাহী ভবন থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান চার রুমবিশিষ্ট সাধারণ এক বাড়িতেই বসবাস করতেন। অপরদিকে যদি ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই যে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও সেখানে কোন প্রাইম মিনিষ্টার হাউজ নির্মাণ করা হয়নি। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখের মত ব্যক্তিগণও সাধারণ এক কুড়ে ঘরে বাস করেন। সেখানে নতুন করে কোন পার্লামেন্ট হাউস নির্মাণ করা হয়নি। ইংরেজ শাসনামলের পার্লামেন্ট ভবনটাই এখনো ব্যবহারাধীন। নতুন কোন প্রেসিডেন্ট ভবনও নির্মিত হয়নি। ইংরেজ আমলের নির্মিত রাষ্ট্রপ্রধান ভবন যা কিনা লাহোরের গভর্নর হাউস ও করাচীর সাবেক গভর্নর হাউসের চেয়ে কোন দিক দিয়ে ভাল নয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট হোক প্রধানমন্ত্রী হোক বা ভিনদেশী প্রেসিডেন্ট বা কোন ভি.আই.পি প্রতিনিধি হোক সকলেই অবস্থান করে। মারুতি বা হিন্দুস্থান নামক গাড়িতে করে সবাই সফর করে থাকে। সেখানেও রোড ক্লিয়ারের নামে যানজট সৃষ্টি করা হয় না। আমার প্রশ্ন শুধু একটি যার জবাব কেবল আপনার অন্তরই দিতে পারে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছরে আমরা কি হারিয়েছি আর কি পেয়েছি এবং ভারত কি হারিয়েছে আর কি পেয়েছে। পাকিস্তানের জনসাধারণের মাথাপিছু ঋণ যেখানে তের হাজার টাকা সেখানে ৯০০ মিলিয়ন আবাদী জমি বিশিষ্ট ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু ঋণ কত টাকা? আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বিবেক খাটান তবেই জবাব পেয়ে যাবেন। এই

জওয়ান আমাকে বলল যে, সে বি.আই এবং অতি সত্বরই তার প্রমোশন হবে। তার জেনারেল নলেজ ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা দেখে তার কাছে আমার কাঙ্ক্ষিত তথ্য জিজ্ঞাস না করাকেই শ্রেয় মনে করলাম। ঠিক এই মুহূর্তে গতকালের করণিকটিও এসে গেল। তাই আমি ওজর পেশ করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করণিকটির কাছে গিয়ে বসলাম। যাতে আমার ব্যাপারে করণিকটির মনে সন্দেহ না হয়।

এমনিভাবে আমার আজকের দিনটিও বেকার গেল। তবে হ্যাঁ, লাভ এতটুকু হয়েছে যে, আমি অনায়াসেই শরাবখানায় আসতে যেতে পারি। পরদিন আমি ADOS এর আফিসে কিছু সময় কাটিয়ে হোটেলে ফিরে আসলাম। আমার আজকের পরিকল্পনা হলো অন্য কোন শরাবখানায় যাওয়া। সন্ধ্যা ৬ টার দিকে আমি রিকশা নিয়ে যাত্রা করলাম এবং অন্য এক শরাবখানায় ঢুকে পড়লাম। এই শরাবখানাতেও আমি অনেক সেনাবাহিনীর সদস্যকে দেখতে পেলাম যাদের মধ্যে শিখও রয়েছে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি আর তা হচ্ছে, কোন শিখের কাছ থেকে কথা বের করা অধিকতর সহজ হয় যদি সে শরাব পান করতে থাকে। পাঞ্জাবি ভাষা তাদের নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। যাহোক। এই শরাবখানাটিতে কম দামের শরাব প্রস্তুত হওয়ায় আমি এক বোতলের অর্ডার দিলাম। কোন টেবিল খালি নেই। এক টেবিলে চারজন শিখ বসে আছে। আমি তাদের টেবিলে একটি খালি চেয়ারের দিকে ইশারা করে পাঞ্জাবি ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, বসতে পারি কি? দুই-তিনজন শিখ একসাথে সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তাদের সাথে একাকার হয়ে গেলাম। পাঞ্জাবি ভাষা অতি দ্রুত আমাকে স্বাভাবিক করে দিল। আমি আরো দুই বোতলের অর্ডার দিলাম। তারা অনেক আপত্তি করে বলল যে, আপনি আমাদের মেহমান, কিন্তু আমি তো দুই বোতলের অর্ডার দিয়েই দিয়েছি। আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমার বোম্বে আসার উদ্দেশ্য তাদেরকে খুলে বললাম। সাথে সাথে এও বললাম, আমি পাঞ্জাবের চোপরা পরিবারের ছেলে। আমার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি আর আমরা মূলত লুধিয়ানার অধিবাসী। বাস্তবেও আমার মাতামহ ভারত বিভক্তির পূর্বে লুধিয়ানাতেই বাস করত। আমি লুধিয়ানার কিছু এলাকা ও রাস্তার নাম মুখস্থ করেছিলাম। বোম্বের সবাই বোম্বেতে বিশেষ উর্দুতে কথা বলে, চাই সে পাঞ্জাবিও হোক না কেন। কিন্তু আমার টেবিলের শিখ চারজন হুবহু পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলছে। আমি তাদেরকে

বললাম, আমার ভাষার লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

চারজন শিখই আমার কথায় মেতে উঠল। কথার পিঠে জিজ্ঞাসা করল, জনাব! তারপর কি হলো? যখনই কথা শুরু হয় তখনই আমি তাদের গ্লাস পটাপট ভরে দিই। তারা পানি মেশানো ব্যতীত এক নিঃশ্বাসে তা শেষ করে ফেলে। আমি পুনরায় গ্লাস ভরলাম তারা পুনরায় শেষ করল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাদেরকে দ্রুত নেশায় আসক্ত করা। যাতে আমার কাঙ্ক্ষিত কথা বের করতে পারি। যখন তারা নেশায় মাতাল প্রায় আমি সুযোগ বুঝে কোপ মারলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এখানে কতদিনের ট্রেনিংয়ে এসেছেন জনাব? তাদের মধ্যে দুইজনের উর্দির চিহ্ন দেখে জানতে পারলাম যে তারা একই রেজিমেন্টের সদস্য। বাকি দুইজন অন্য রেজিমেন্টের। একই রেজিমেন্টের শিখদ্বয় বলে উঠল যে, তারা তিন মাসের ট্রেনিংয়ে এসেছে। আর মাত্র পঁচিশ দিন পর তাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবে। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, শুধুমাত্র তিন মাসের ট্রেনিং করাতেই ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবে। জবাবে তারা বলল, না জনাব, নতুন রিক্রুটদের জন্য তো অনেক সময় লাগে। আর আমরা তো শুধু নতুন ট্যাংকের ট্রেনিং নিতে এসেছি। আমি অজানার মত জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন ট্যাংক বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন? আমার জানামতে আমাদের কাছে তো রাশিয়ান টি ট্যাংক আছে। উত্তরে সে মাতাল অবস্থায় দুলতে দুলতে বলল, বাউজি মটরের মডেল যেমন প্রতি বছর পারিবর্তন হয় কিন্তু নাম একই থাকে তেমনিভাবে বছর দুয়েক পরে নিউ ট্যাংকও হয়ে যায় পুরাতন। আর এখন নতুন টি সিরিজ এসেছে। মদের নেশায় সে নতুন আসা টি সিরিজ ট্যাংকের নাম্বার পর্যন্ত বলে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ট্রেনিং শেষে স্বীয় রেজিমেন্টাল সেন্টারে যাবেন না ছুটিতে বাড়ি যাবেন? উত্তরে সে বলল, প্রথমে রেজিমিন্টাল সেন্টারে যাব তারপর সেখানে রেজিমেন্ট DIPLOY হবে। আমি বললাম, সর্দারজী! আমি একজন চা ব্যবসায়ী! আপনার কথার কোন মাথামুণ্ডু আমার বুঝে আসছে না। আমি নিজেকেও নেশার ঘোরে মাতাল প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলাম। যেন আমার কোন প্রশ্ন তাদেরকে কোন প্রকার সন্দেহে না ফেলে। এরপর সে বলে উঠল, হ্যাঁ ভাই! প্রত্যেক ইনফেন্টারি ডিভিশনের সাথে এক দুইটি ট্যাংক রেজিমেন্ট থাকে। আর যে ইনফেন্টারি ডিভিশনের সাথে আমাদের রেজিমেন্ট জড়িত তা ফাজালিকা হেড ওয়ার কাছের নিকটবর্তী। তারপর সে ভালভাবে

বোঝাতে গিয়ে বলল যে, আর্টিলারী বাহিনী প্রথমত আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে। তারপর কখনো ট্যাংক রেজিমেন্ট আগে এবং ইনফেন্টারি পিছে অথবা কখনো ইনফেন্টারি রেজিমেন্ট আগে এবং আমরা পিছে। এমনিভাবে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করে থাকি। বাকী তিনজন শিখের কাছ থেকেও বিশেষ বিশেষ তথ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হলাম যা আমি এখানে হুবহু বর্ননা করতে অক্ষম। মোটকথা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলাম। আমি তাদের খাবারের অর্ডার দিলাম এবং পরদিন মিলিত হবার ওয়াদা ব্যক্ত করে রাত সাড়ে এগারটায় যার যার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালাম। আমি হোটেলে পৌছে এসকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিজ কোড নাম্বারে লিখে নিলাম। এটা হচ্ছে আমার প্রথম সফলতা যার জন্য আমি আনন্দিত। পরদিন আরো বেশি তথ্য উদ্ধারের পরিকল্পনা করে শুয়ে পড়লাম।

আমার প্রথম রিপোর্ট আমি এমনভাবে পাঠাতে চাচ্ছিলাম যাতে আমার সিনিয়র আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। পরদিন সকাল বেলা যখন গত রাতের তথ্য সম্পর্কে জরিপ করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, এ সফলতা খুবই কম। আমি এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি ট্যাংক রেজিমেন্ট সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছি। প্রথমে আমার রিপোর্ট সন্দেহমুক্ত করতে মদ্যপ শিখ থেকে অর্জিত তথ্য পরীক্ষা করতে হবে। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটা যে, আমাকে শুধু এই কয়টি রেজিমেন্ট সম্পর্কে অবগত হলেই চলবে না, বরং ঐ সমস্ত রেজিমেন্ট সম্পর্কেও অবগত হতে হবে যারা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে চলে গেছে। যখন আমি আমার মিশন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জরিপ করলাম তখন এই তথ্য খুবই সাধারণ মনে হলো। আহমেদনগরে প্রশিক্ষণার্থী রেজিমেন্ট শুধুমাত্র তিন মাসে ট্রেনিং কমপ্লিট করেই ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার পূর্বেই নতুন রেজিমেন্টের জওয়ানরা এসে উপস্থিত হয়। এই ক্রমধারা '৭১-এর যুদ্ধের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে চালু রয়েছে। আর এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে। এই ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার বা ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে অবশ্যই এমন কোন ফাইল থেকে থাকবে যার মাধ্যমে সমস্ত তথ্য পেতে পারি। আহমেদনগর Transitcamp এর মত ছিলো। আমি আশা করেছিলাম যে, সেখানে আগমনকারীদের তথ্য সম্বলিত ফাইল প্রথমত উভয় হেড কোয়ার্টার অফিসে অতঃপর ক্যাম্প কমান্ডিন্ট অফিসে অন্যথায় লঙ্গরখানা

থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই তিন অফিসের মধ্য হতে আমি ক্যাম্প কমান্ডিন্ট অফিসকে নির্বাচন করলাম। কেননা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে ট্রেনিং ছাড়াও অধিকাংশ সময় আরও অনেক কিছু চলে। পক্ষান্তরে ক্যাম্প কমান্ডেন্ট হলো শুধুমাত্র আগন্তুকদের থাকা খাওয়া ও যাতায়াতের যিম্মাদার। আমার ধারণা অনুসারে এই অফিস থেকে তথ্যে পরিপূর্ণ এমন একটি ফাইল পাওয়ার আশাবাদী ছিলাম যা আমার প্রথম মিশনকে সফল করবে। ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিস পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমি সহায়ক হিসেবে ADOS এর করণিককে নির্বাচন করলাম। যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। তাই প্রস্তুত হয়ে ADOS এর অফিসের দিকে যাত্রা করলাম। সিকিউরিটি এবং চেকপোষ্ট অতিক্রম করে করণিকের অফিসে পৌঁছালাম এবং বললাম যে, মন খারাপ থাকায় গতরাতে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। ADOS এর অফিসে স্থানীয় ঠিকাদাররা টেন্ডার আদান প্রদান, টাকা উঠানো এবং নতুন টেন্ডারের খবরাখবর নেয়ার জন্য যাতায়াত করে। যার জন্য এই অফিসটি অধিকাংশ সময় লোকে লোকারণ্য থাকে। সুতরাং আমার উপর সন্দেহ করার কেউ ছিলো না। আর আমি তো সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে যাচ্ছি না বরং একজন চা ব্যবসায়ী হিসেবে যাচ্ছি।

আমি সরাসরি করণিকের অফিসে গিয়ে বসে পড়লাম এবং এটা সেটা আলোচনা করতে থাকলাম। আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম এবং সুযোগ পেয়েও গেলাম, যখন খাবারের বিরতিতে সে আমাকে কেন্টিনে নিয়ে গেল। সেখানে আমরা নির্জনে বসে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আমি আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাই। আমি এখানে চা বিক্রি করতে এসেছি, নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে আসিনি। আপনি এর পূর্বে সাক্ষাতে আমাকে বলেছিলেন যে, সম্পর্ক বৃদ্ধি ও অফিসারদের মনোরঞ্জন ব্যতীত কাজ হবে না। আমাকে একটু খুলে বলুন কাকে কাকে খুশি করতে হবে। তখন সে বলতে শুরু করল– আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে, যেখানে একই পণ্যের সাপ্লাইকারী একাধিক হয়ে যায় সেখানে অফিসারদের মন জয় করতেই হয়। এখানে ADOS ছাড়াও লঙ্গর ইনচার্জ, আমি সাথে সাথে যোগ করলাম ক্যাম্প কমান্ডেন্ট অফিসারের নাম। আর এতে সে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। আমি তাকে বললাম যে, আমাকে এদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আপনার জিম্মায়। যদি আমি এখানে চা বিক্রিতে সফল হতে পারি তবে তার সমস্ত কৃতিত্ব হবে আপনার আর এতে আপনারও অনেক কল্যাণ সাধিত হবে। এ কথা বলতে বলতে আমি চুপে চুপে তার হাতে দু'হাজার টাকা গুজে

দিলাম। আর সে লৌকিকতা দেখিয়ে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু আমি একটু জোর দেওয়াতে সে টাকাগুলো গ্রহণ করে পকেটে রেখে দিল। আমি তাকে বললাম যে, এ হলো এডভান্স। আপনি আমার কাজ করলে আমি অবশ্যই আপনাকে খুশি রাখব। আমার কথা শেষ হতেই সে উৎসাহী ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, আপনার কথামত আপনার চায়ের কোয়ালিটি অনেক উন্নত এবং মূল্যও অনেক কম। আপনি যদি ভাগ্য গুণে সাপ্লাই-এর অর্ডার পেয়ে যান। তবে আপনাকে সাপ্লাই চালু রাখতে হবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর সবাইকে ডেলিগেট করে পার্টি দিতে হবে। আর এতে তো আপনার লাভ ক্ষতিতে পরিণত হবে।

একথা শুনে আমি হেসে উঠলাম এবং বললাম যে, এই ব্যবসার একটা গোমর আছে কিন্তু তা আমি আপনাকে বলছি শুনুন। ধীরে ধীরে কোয়ালিটি কমিয়ে ফেলব। আর অকল্পনীয়ভাবে এই ক্ষতি লাভে পরিণত হবে। তাছাড়া আমি হচ্ছি এক বড় ব্যবসায়ী পরিবার অর্থাৎ চোপড়া পরিবারের ছেলে। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে তড়িৎ লাভের আশা করো না। যদিও প্রথমে কিছুটা ক্ষতি হয়, কেননা পরবর্তীতে এই ক্ষতি লাভে পরিণত হবে। সে আমার কথায় মানসিকভাবে এমন কাবু হয়ে গেল যে, সে তখনী আমাকে লঙ্গর ইনচার্জ ও ক্যাম্প কমান্ডেন্ট অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করাতে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং আমাকে লঙ্গরখানার দিকে নিয়ে চলল।

লঙ্গর ইনচার্জ তখন ফৌজি জওয়ানদের খানা বণ্টনে ব্যস্ত ছিলো। করণিক তাকে নিজের দিকে ইশারায় ডাকল। সে ছিল সুবেদার এবং দেখতে পুরনো ঘাঘু মনে হল। আমাকে তার সাথে পরিচয় করানোর পর করণিক সুবেদারকে বলল যে, ইনি আমার বন্ধু। এই ব্যক্তির চা আপনার কাছে আসবে এবং তাকে সাপ্লাইয়ের অর্ডার পাইয়ে দেওয়া আপনার কাজ। আর তার এ কাজ হতেই হবে। সে আপনার সেবা করবে। সুবেদার আমাকে পর্যবেক্ষণ করে বলল যে, যদি মাল ভালো হয় তবে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা করব। সাথে সাথে সে করণিককে আমাকে সাথে নিয়ে সন্ধ্যায় তার বাসায় যেতে বলল। তার সাথে কথার্বাতা শেষ করে আমরা ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিসের দিকে যাত্রা করলাম। ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিস কোয়ার্টার গার্ডের সাথেই অবস্থিত। ক্যাম্প কমান্ডেন্ট একজন পুরাতন কর্নেল। আমি খানার সময় অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার অফিসের সকল করণিকের সাথে আমার সাথী করণিকের অন্তরঙ্গতা দেখে বুঝতে পারলাম যে, তলে তলে ADOS এর অফিস থেকে শুরু করে লঙ্গর ও ক্যাম্প কমান্ডেন্ট পর্যন্ত

সকলে একই শিকলে গাঁথা। এরা সকলে মিলে বাট করে খায়। ক্যাম্প ট্রেনিং-এর জন্য ফৌজি জওয়ানরা শুধুমাত্র তিন মাসের জন্য আসে। যার ফলে তাদের খাবার লেবাস এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা ফ্রি প্রদান করা হতো তার কোয়ালিটিতে হেরফের করে ঠিকাদারদের যোগসাজসে অধিক মূল্যের টেন্ডার মঞ্জুর করানো হয়। আর এ কারণেই এই তিন অফিসের করণিকদের পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা। সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে আমি ফিরে আসি। কেননা সন্ধ্যায় লঙ্গর ইনচার্জের বাসায় যেতে হবে। ADOS এর করণিকের কাছে শিয়ামকে পাঠালাম। শিয়াম ফিরে এসে আমাকে বলল যে, লঙ্গর ইনচার্জকে খুশি করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা সাথে নিতে হবে। সন্ধ্যা ছটার দিকে হোটেল থেকে ছাউনির দিকে যাত্রা শুরু করলাম। শিয়াম নির্দিষ্ট স্থানে আমার জন্য অপেক্ষায় ছিল। আমরা উভয়ই ৭ টার সময় লঙ্গর ইনচার্জের ঘরে পৌঁছে গেলাম। লঙ্গর ইনচার্জ ফ্যামিলি কোয়ার্টারেই থাকত। সে আমাদেরকে এক রুমে বসিয়ে নিয়ম মাফিক আদর আপ্যায়নের পর নিজেই চায়ের কথা তুলল এবং নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলল যে, যদি আমি চা পাচার না করি তবে ADOS ওয়ালারা কিছুই করতে পারবে না। যাই হোক, আমাকে বার তেরশ' জওয়ানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। সুবেদার হতে একজন জওয়ানের প্রায় বাইশ তেইশ বছর সময় লেগে যায় এবং সে রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি চলে যায়। এমন সুবেদারের যদি ভাগ্যগুণে সেন্টারে পোস্টিং হয় তখন এমন লোক খুব কমই হয় যারা নিজেদের হাত পঙ্কিলতা মুক্ত রাখতে পারে। তাই সুবেদার সুস্পষ্ট ভাষায় বলে ফেলল যে, আমি শুধু আপনার চা পাচারই করব না বরং প্রশংসাও করব। কিন্তু তালি তো দুই হাতে বাজাতে হয়। সুবেদারকে সঠিক পথে আনার ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম কিন্তু সে নিজেই মুশকিল আসান করে দিল। সে বলল যে, শুধুমাত্র জওঁয়ানদের ও ATCOS দের জন্য বড় কাপে প্রতিদিন চার হাজারেরও বেশি চা বানানো হয়। এর দ্বারাই আপনি অনুমান করতে পারবেন যে, আপনার কত চা আমরা ব্যবহার করব। মঞ্জুরির দ্বিতীয় ধাপ আপনিই ফয়সালা করবেন। যে তারিখ থেকে আপনার চা লঙ্গরখানায় ব্যবহার হবে তখন থেকে আমি প্রতি মাসে আপনার কাছ থেকে পাঁচ হাজার করে টাকা নেব।

আমি এ শর্ত মেনে নিলাম এবং এডভান্স হিসেবে দুই হাজার টাকা দিয়ে দিলাম। এর অল্পক্ষণ পরেই আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শিয়াম আমাকে রাত ৮ টায় শরাবখানায় সাক্ষাৎ করতে বলেছিল। আটটা বাজার

আর কিছু সময় বাকি আছে। আমি হোটেলে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে শরাবখানায় চলে গেলাম। আমার টাকা উড়াতে দেখে শিয়াম আমাকে বড় শিকার মনে করেছিল এবং আমাকে তার উপস্থিতিতেই দ্রুত ক্যাম্প কমান্ডেন্ট অফিসের করণিকদের সাথে সাক্ষাত করাতে চাচ্ছে। যেন তার অনুপস্থিতিতে আমার কোন DEAL না হয়। সেজন্য রাত ৮ টায় সে ফৌজি জওয়ানদেরকে তার সাথে নিয়ে আসল এবং আমাকে বলল যে, তারা ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিসে কাজ করে। সেই রাত আমরা গল্প-গুজবেই কাটিয়ে দিলাম। তাছাড়া শিয়ামের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ এমনিতেই হয়েছিল যে, সে কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সবার সাথে সাক্ষাৎ করাচ্ছে ? অথচ দুপুর বেলা এই দুই জওয়ানকে ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিসে দেখেছিলাম। তারপরও মনের প্রশান্তির জন্যে সেই সন্ধ্যায় কাজের কথা এরচেয়ে বেশি আর বাড়ালাম না। বরং তাদের বললাম যে, আগামীকাল আমি শিয়ামের অফিসে আসব এবং তাকে নিয়েই ক্যাম্প কমান্ডেন্টের অফিসে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করব। তখন আমি তার চেহারা দ্বারাই প্রবল আবেগের পরিমাপ করতে ছিলাম।

মদের নেশায় মানুষ ভিতরের কথাও বলে ফেলে এবং তার চেহারা মনের দর্পণ হয়ে যায়। শিয়াম ও অন্য একজন জওয়ান যখন মদ পান করে হাসি খুশিতে মত্ত ঠিক তখন অন্য এক জওয়ান চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আমি চিন্তামগ্ন জওয়ানের পানে তাকালাম এবং তাকে বললাম, কী ব্যাপার বন্ধু! হৃদয় রাণীর কথা মনে পড়েছে বুঝি! যার দরুন চুপ চাপ বসে আছ? সে মলিন মুখে হাসির রেখা টেনে চুপ হয়ে গেল। আমি দুই তিনবার পীড়াপীড়ি করলাম কিন্তু তারপরও সে মনের কথা বলল না এবং তার চিন্তামগ্নতা ও নীরবতায় কোন পার্থক্য হল না। শরাবখানায় কোন টয়লেট ছিল না বলে আমি কনিষ্ঠাঙ্গুলি ইশারা করে প্রাকৃতিক হাজতের কথা প্রকাশ করলাম। জবাবে শিয়াম পথের অপর প্রান্তের কথা বলল। তখন আমি চিন্তামগ্ন জওয়ানের হাত ধরে তাকে সাথে নিয়ে বাইরে আসলাম। পথের অপর প্রান্তে হাজত সেরে তাকে বললাম, দোস্ত! এমন স্থানে কেন গম্ভীর হয়ে বসে আছ, যেখানে এসে মানুষ চিন্তা মুক্ত হয়? টেনশনতো আমারও অনেক আছে, কিন্তু প্রত্যেক টেনশনের অবশ্যই কোন না কোন সমাধান আছে। যদি তুমি কোন কিছু মনে না কর তবে আমি তোমাকে সঠিক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার পথে আমার সাথে হোটেলে যেয়ো, ওখানে নীরবে কথা বলব।

সে কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বলল, জনাব! আপনি প্রথম সাক্ষাতেই আমার পেরেশানী ধরে ফেলেছেন অথচ আমার সাথীরা সারাক্ষণ আমার সাথে থাকে, কিন্তু কোনদিন একটিবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। আপনাকে একজন হৃদয়বান মানুষ মনে হচ্ছে। আমি ফেরার পথে আপনার সাথে হোটেলে যেতে প্রস্তুত। শরাবখানা থেকে আমি আধা ঘন্টা পর উঠে যাব এবং সিভিল ড্রেসে আপনার হোটেলে পৌছব। আপনিও আমার আসার পর-পরই উঠে আসার চেষ্টা করবেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। তারপর আমরা ফিরে আসলাম। আমি তার গ্লাসে বেশি করে শরাব ঢেলে দিলাম যেন সে বেশি নেশাগ্রস্ত হয়। কিছুক্ষণ পর সে মাথা ব্যথার কথা বলে সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমাদের টেবিলের আলোচনা তখন সরগরম। যার ফলে তার চলে যাওয়ার প্রতি বাকিরা কোন খেয়ালই করেনি। সাড়ে এগারটার কাছাকাছি আমাদের আড্ডা ভেঙ্গে যায়। আমার বিশ্বাস আমার মত শিয়াম ও তার সাথীরাও ভবিষ্যত চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে থাকবে।

আমি শরাবখানা থেকে বের হয়ে রিকশা যোগে হোটেলের পথ ধরলাম। অশোক হোটেল লবিতে আমার আপেক্ষায় ছিলো। তাকে সাথে নিয়ে আমি আমার রুমে চলে আসলাম এবং শরাবখানা থেকে সাথে করে আনা বোতল খুলে তাকে এক পিগ বানিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম যে, মানুষ যদি মানুষের কাজে না আসে তবে কি পশু-পাখি কাজে আসবে। আমি তাকে এও বললাম, আমি একদম একা মানুষ। আমার যা প্রয়োজন তার চেয়ে আমার আয় অনেক বেশি। আমি বোম্বে থাকি, ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। জাতে পাঞ্জাবি বটে, কিন্তু জাতিভেদে বিশ্বাস করি না মানুষকে ভালবাসি বলে। তোমাকে ভারাক্রান্ত দেখে বসে থাকতে পারিনি। তোমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম। এবার পরিষ্কার করে বলো, কোন সে বিষয় যা তোমাকে এতটাই ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। যতদূর সম্ভব আমি তোমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করব।

শরাবের নেশায় অশোকের মনের সকল বন্ধ দরজা খুলে গেল। যদ্দরুন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করল। আমি চাচ্ছিলাম যে, সে যেন বেশি না কাঁদে। কারণ দুঃখের সময় কাঁদার দ্বারা শুধু প্রশান্তিই পাওয়া যায় না বরং ব্যথাও হালকা হয়। তাই আমি অশোকের গা ঘেঁষে বসলাম ও তাকে প্রবোধ দিতে থাকলাম। আমি তাকে বললাম যে, পুরুষ কখনো কাঁদে না, আর তুমি একজন পুরুষ আর সেই সাথে সৈনিকও। তোমার তো কখনো কাঁদা উচিৎ নয়, বরং পেরেশানী দূর করার জন্য চেষ্টা তদবির করা উচিত। আর এর

সাথে রয়েছে আমার সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার। এভাবে আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম। এক পর্যায়ে সে মুখ ফুটে বলতে শুরু করল– জনাব! আমার পিতা ইহকাল ত্যাগ করেছেন এবং ঘরে বিবাহযোগ্য তিনটি বোন রয়েছে যাদের বিয়ে আজ পর্যন্ত এ কারণে হয়নি যে, আমার যৌতুক দেয়ার সাধ্য নেই। বড় বোনের বাগদান হয়েছে দুই বছর হলো কিন্তু যৌতুকের অভাবে কাবিননামা হয়নি। ছেলে পক্ষ এখন বাগদান ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। জননী আমার এই দুঃখে শয্যাশায়ী। আমি শত চেষ্টা করেও কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমি জীবন বাজি রেখে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত কিন্তু আমার বোনের বাগদান ভেঙ্গে যাবে এটা সহ্য করতে পারব না।

তার দুঃখের এই করুণ কাহিনী এশিয়া মহাদেশের শত শত ঘরের এক মর্মস্পর্শী দাস্তান। লাখ লাখ যুবতী বিবাহের বয়স অতিক্রম করে বুড়ি হতে চলেছে। পিতা-মাতার নিঃস্বতার কথা বরপক্ষ শ্রবণ করতেও প্রস্তুত নয়। অথচ বরের বিবাহে আনন্দ উল্লাসের কমতি থাকে না। আর যে মেয়ে পক্ষের কোন কিছু দেওয়ার মত থাকে না তাদের মেয়েদের হয়তো মিথ্যা আশা বুকে চেপেই বুড়ি হতে হয়। অন্যথায় যারা একটু মডার্ণমনা তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের অনেকের শেষ পরিণতি হয় পতিতালয়। আমি অশোককে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কত টাকার প্রয়োজন? জবাবে সে বলল যে, পঁচিশ হাজার টাকা পেলে অনায়াসেই তার বড় বোনের বিবাহ দিতে পারবে। আমি তাকে বললাম যে, সে যদি পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েও যায়, তবু শুধুমাত্র বড় বোনের দায় থেকে মুক্তি পাবে। অন্য দুই বোনের জিম্মাদারী তখনও থেকেই যাবে। আমি তাকে বললাম যে, আমি তোমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত কিন্তু আমিও একজন একনিষ্ঠ বন্ধুর সন্ধান করছি এবং আশা করি তুমিই হবে সেই কাঙ্ক্ষিত বন্ধু। অতএব, কোন প্রকার চিন্তা করো না। আমি তোমার নিঃস্বতার পাশে দাঁড়াবো। আমি তাকে বললাম যে, বোম্বেতে আমরা একটি ক্লাব নির্মাণ করেছি যার সদস্য শুধুমাত্র অবিবাহিত যুবক যুবতীরাই হতে পারে। এই ক্লাবে আমরা সর্বস্তরের জনগণকে সদস্য করে থাকি। আমরা তাদের জন্য শুধু উপযুক্ত বর তালাশ করেই ক্ষান্ত হই না, বরং শাদীর জন্য আর্থিক সহযোগিতাও করে থাকি। আমি তোমার বড় বোনের জন্য আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে পুরো পঁচিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করব এবং তোমার অন্য দুই বোনের জন্যও ক্লাবের সহযোগিতায় উপযুক্ত বর তালাশ করব। হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়ার মত করে আমি তাকে বললাম যে, অনেক ফৌজি জওয়ানও

আমাদের ক্লাবের মেম্বার যাদের মধ্যে ট্যাংক রেজিমেন্টের কিছু জওয়ান এবং অফিসারও রয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে ট্যাংক রেজিমেন্টের এক জওয়ান আমাদের ক্লাবের সদস্য ছিলো। সে এখানে ট্রেনিং করতে এসেছে। তার বড় বোনের বিবাহও একই কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। সম্ভবত সে পাঞ্জাব এলাকার অধিবাসী। সে আমাদের ক্লাবের দিল্লী শাখার সদস্য। তার বোনের বিবাহ আমাদের ক্লাবের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। ক্লাবের নীতিমালা অনুযায়ী ক্লাব থেকে গ্রহণকৃত টাকা একদম সহজ কিস্তিতে তার পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু সে দুই তিন কিস্তি পরিশোধ করেই আমাদের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। হায় আফসোস! আজ প্রয়োজনের মুহূর্তে তার নাম ও রেজিমেন্টের নাম কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না। একটিবারের জন্য হলেও যদি তার নাম স্মরণে আসত তবেই তাকে চিনে ফেলতাম এবং যোগাযোগ করে বাকি টাকা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানাতাম। আমি বললাম যে, আর্থিক সাহায্য গ্রহণকারীরা যদি কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দেয় তবে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি কিভাবে চলতে পারে তুমিই বল? আমি এই কথা দুইবার উচ্চারণ করে বললাম যে, যদি জওয়ানদের নাম ও রেজিমেন্টের লিস্ট সামনে পাই তবে অবশ্যই তাকে চিনতে পারব।

অশোক তার সকল সমস্যার সমাধান আমার মাঝে দেখতে পাচ্ছিলো। যার জন্য তাকে শুধু আমার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন। তখনই সে বলতে শুরু করলো, স্যার! আপনার বড় করুণা যে, বিপদকালে আপনি আমাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ধরা পড়লে কোর্ট মার্শাল হওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও জীবন বাজি রেখে হলেও আমাদের অফিসের করণিকের কাছে রক্ষিত পুরো ফাইলটি আগামীকাল রাতে আপনার হোটেলে এনে দেব। আর তা থেকে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে নিবেন এবং পরদিন সকাল বেলা অফিস টাইমের পূর্বেই আপনার কাছ থেকে ফেরত নেব। দয়া করে আপনি এ কথা আর কাউকে জানাবেন না। কিছুক্ষণ পর তাকে বিদায় করার সময় তার পকেটে দুই হাজার টাকা গুঁজে দিলাম। এই ফাইল হস্তগত করা আমার কাছে সাত রাজার ধন পাওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আর অশোককে তো আমি পুরোপুরিই হস্তগত করে ফেলেছি।

পরদিন সকাল বেলা আমি এ.ডি.ও.এস- এর অফিসে গেলাম। লেফটেনেন্ট গোপ্তা ছিলেন এ.ডি.ও.এস। আমি তাকে বললাম যে, জনাব! আমি এখানে এসেছি কয়েকদিন হয় অথচ আমার চায়ের স্যাম্পল এখনও আপনার অফিসেই পড়ে আছে। বোম্বের আরাম আয়েশের জিন্দেগী ছেড়ে

এই দূর দেশের হোটেলে এক রকম বন্দী জীবন কাটাচ্ছি এবং অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। অতএব আপনি আমার স্যাম্পল সম্পর্কে তদবীর করুন যাতে দ্রুত কোন ফয়সালায় আসতে পারি। এ.ডি.ও.এস-এর সাথে সকল কথাবার্তা ইংলিশে হচ্ছিল। যার ফলে সে আমার ব্যক্তিত্ব ও বেশভুষা এবং ইংলিশ স্পোকেন দেখে আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল। সে আমার সামনে তার অফিসের এক করণিককে আমার স্যাম্পল লঙ্গরখানায় পাঠানোর নির্দেশ দিল এবং আমাকে বলল যে, লঙ্গরখানায় ব্যবহারের জন্য স্যাম্পল পাঠানো এখানকার প্রথাগত কাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমি লঙ্গরখানায় পাঠানো ব্যতীতই সিদ্ধান্ত নিতে পারি। যখন তোমার অতিষ্ঠ হওয়ার কথাই উঠেছে, তুমি তাহলে আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার মেহমান হবে। তোমাকে সাথে নিয়ে আমি নিজেই অফিসার মহলে যাব।

আমি কর্ণেল গোপ্তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অফিসের করণিকের কাছে চলে আসলাম এবং শিয়ামের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম। সে আমাকে জানালো যে, কর্ণেল গোপ্তা আপনার স্যাম্পল লঙ্গরখানায় পাঠানোর অর্ডার দিয়েছেন। আমি তাকে জানালাম যে, আমি এইমাত্র তার সাথে সাক্ষাত করেই এলাম। এখন যেহেতু দ্রুত কাজ করতে হবে তাই আমাকে ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিসে নিয়ে চলো। আমি ওখানে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করলাম যে, যেহেতু স্যাম্পল লঙ্গরখানায় পাঠানো হয়েছে তাহলে হয়তো আজ অথবা কাল তা ওখানে ব্যবহার করা হবে। ক্যাম্পে অবস্থানকারীরা লঙ্গরখানা সম্পর্কে কোন অভিযোগ সরাসরি লঙ্গরখানায় করতে পারে না বরং উপরস্থ অফিসারের মাধ্যমে কমাডেন্টের কাছে করতে পারে। আর ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিসে সে সব অভিযোগ যাচাই বাছাই করা হয়। এটা সামরিক ডিসিপ্লিনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিছুক্ষণ পর সিয়াম আমাকে নিয়ে ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর অফিসে গেল। আমি সেখানে গিয়ে অশোকের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম আর দেখা হয়েও গেল। তার চেহারায় আমি প্রশান্তির ছাপ দেখতে পেলাম। সে চোখে চোখেই আমাকে বলল যে, তার কাজ হয়ে গেছে। শিয়াম অন্য এক করণিককে আমাকে দেখিয়ে বলল যে, উনার স্যাম্পল আজ লঙ্গরখানায় পাঠানো হয়েছে, যদি কোন অভিযোগ সেখান থেকে আসে তবে তা জানাতে। দ্বিতীয় করণিকটি সেই যে গতরাতে শিয়াম ও অশোকের সাথে ছিলো। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসার সময় কাকতালীয়ভাবে ক্যাম্প কমান্ডেন্ট-এর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। শিয়াম তাকে স্যালুট করল। সে আমার দিকে

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল। আমি আগবাড়িয়ে তাকে আমার পরিচয় দিলাম এবং বললাম যে, আমার চায়ের স্যাম্পল আজ লঙ্গরখানায় পাঠানো হয়েছে। আমরা উভয়েই ইংরেজিতে কথাবার্তা বললাম। কলারে লাল পট্টি ধারণকারী ক্যাম্প কমাণ্ডেন্টের পদে নিয়োজিত এমন একজন কর্ণেল আমাকে সাধারণ একজন করণিকের সাথে দেখে খুশি হতে পারল না। সে আমাকে বলল যে, যদি আপনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসে থাকেন তবে আমার অফিসে চলেন। আমি শিয়ামকে ইশারায় পাঠিয়ে দিয়ে কর্ণেলের পিছে পিছে তার অফিসে চলে গেলাম।

তার অফিসটি খুবই সাজানো গোছানো। তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি তাকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিলাম। তার নাম ছিলো কর্ণেল মাথুরা। আমি তাকে বললাম যে, কর্ণেল সাহেব! আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করার জন্য এই পর্যন্ত দুইবার এসেছি কিন্তু একবারও সাক্ষাত করতে পারিনি। আমি আরও বললাম যে, আমার চা টেস্টের জন্য এ.ডি.ও.এস-এর অফিস থেকে লঙ্গরখানা পর্যন্ত পৌঁছেছে। নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম আপনার সাথেই সাক্ষাত করার কথা ছিল। কেননা, সমস্ত ক্যাম্প অফিসার ও জওয়ানরা আপনার ইনচার্জে এবং তা দেখাশোনার দায়িত্বও আপনার যিম্মায়। আমি এখানেরই একটি হোটেলে উঠেছি এবং আমার পক্ষে এখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় বলে আসার সাথে সাথেই আমার বিজনেস কার্ড পেশ করেছি। এখন গ্রীষ্মকাল হওয়ায় ক্যাম্পের বহির্ভাগের গরম হাওয়া রুমেও লাগছে। তবে এয়ারকন্ডিশন গরমকে লাঘব করে দিয়েছে।

কর্ণেল সাহেবকে শান্তই মনে হল। আমি অসময়ে তার কাছে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি একদম শীতল হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, চা পান করবেন, না কফি? আমি তাকে বললাম যে, আমি একটি শর্তে চা পান করতে পারি আর তা হলো যদি আমার চা দিয়ে প্রস্তুত করেন। আমার ব্রিফকেসে দুই প্যাকেট স্যাম্পল ছিলো। সেগুলো বের করে আমি টেবিলের উপর রাখলাম। কর্ণেল নিজ ব্যাটম্যানকে ডেকে আমার প্রদানকৃত চা প্রস্তুত করতে বললেন। অল্প সময়ের মধ্যেই চা প্রস্তুত হয়ে গেল। কর্ণেল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চায়ের মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে দাম বলে দিলাম। চায়ের কাপ শেষ করেই তিনি লঙ্গর ইনচার্জকে ফোনে আমার দেয়া চা তার পছন্দের কথা জানালেন। আমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম। কিছু সময় এটা ওটা বলে কাটিয়ে দিলাম। তারপর তার কাছ থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। আসার সময় তাকে বললাম যে,

আগামী কাল আমি কর্ণেল গোপ্তাকে সাথে নিয়ে অফিসার মিলনায়তনে আসছি। আশা করি সেখানে আপনার দেখা পাবো। কর্ণেল সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন এবং মুচকি হেসে বললেন, ইয়াংম্যান ইউ লুক লাইক অফিসার, সো ট্রাই টু রিমেইন অ্যামোং অফিসার'স। আমি দ্বিতীয়বারের মত তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। কর্ণেল হঠাৎ কি যেন ভেবে আমাকে বললেন যে, আমার ট্রান্সপোর্ট তোমাকে হোটেলে রেখে আসবে। দশ মিনিটের মধ্যেই একটি জীপ অফিসের সামনে এসে গেল এবং এটিতে করে আমি হোটেলে চলে আসলাম।

কর্ণেল মাথুরা ও কর্ণেল গোপ্তা অফিসের করণিকদের সাথে আমার সখ্যতা দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের কি জানা ছিল যে, যে কাজ তাদের অফিসের করণিকরা আমার জন্য করছে তা কি কোন অফিসারদের দ্বারা সম্ভব হত? হোটেলে এসে আমি খানা খেলাম এবং অশোকের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফাইলের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলাম। সন্ধ্যা সাতটার দিকে অশোক রিসিপশন রুম থেকে আমার কাছে ফোন করল। আমি তাকে রুমে আসতে বললাম। সে তার হাতে একটি হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে সিভিল পোশাকে এসেছে। গতরাতের অবশিষ্ট শরাব আমি তার সামনে রাখলাম। তাকে ভীত মনে হচ্ছিল। পানি মিশানো ব্যতীতই সে আধা গ্লাস পান করে ফেলল। হ্যান্ড ব্যাগ খুলে তার মধ্য থেকে দুইটি ফাইল বের করে আমাকে তা দিয়ে বলল যে, একটিতে অতীত আট মাসের আগমনকারী সকল রেজিমেন্টের বিবরণ বিস্তারিতভাবে রয়েছে এবং দ্বিতীয় ফাইলটিতে রেজিমেন্টের সকল জওয়ান ও অফিসারদের নাম রয়েছে। সে আমার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টি ফেলে বলল যে, এই দুই ফাইল থেকে আপনার প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য আপনি নিতে পারেন। আমি ফাইল দুটি এক করণিকের আলমারী থেকে চুরি করেছি। এখন আমি যাচ্ছি, আগামীকাল সকাল সাতটার পূর্বেই আপনার কাছ থেকে এগুলো ফেরত নিবো। আমি এই ফাইল চুরি করে এক অমার্জনীয় অপরাধ করেছি। যদি ধরা পড়ে যাই তবে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। আমি এ সকল মুসিবতের পাহাড় একমাত্র আমার বোনের জন্যই মাথা পেতে নিয়েছি।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে, এই ফাইল তো তোমার হেফাজতে ছিলো না। যদি চুরির ব্যাপারে কেউ জেনে যায় তবে দায়িত্বশীল করণিকই এর জন্য ফাঁসবে। তাছাড়া কাল তো তুমি তা ফেরত নিচ্ছোই। তাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে বাকি টাকা অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা করার ওয়াদা করলাম।

অশোক বাকি শরাব টুকুও গ্লাসে ঢালল এবং ঢকঢক করে পান করে ফেলল। এত শরাব পান করা সত্ত্বেও সে ভয়ে কম্পমান। হ্যান্ড ব্যাগ ফেলে রেখেই সকালে আসার কথা বলে সে চলে গেল। আমি ফাইল দুটি এক নজর দেখে অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে তা আমাদের জন্য কতটা মূল্যবান তথ্যবহুল। এই ফাইলে '৭১ সালের যুদ্ধের পর ট্রেনিং নেয়ার জন্য আগমনকারী সকল রেজিমেন্টের নম্বর, অফিসার ও জওয়ানদের সংখ্যা, কোন ট্যাংকের উপর ট্রেনিং নিয়েছে তারপর কোথায় গেছে এসব বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। দ্বিতীয় ফাইলটি অনেক মোটা। এই ফাইলটিতে প্রত্যেক রেজিমেন্টের জওয়ানদের নাম, র‍্যাংক, নাম্বার এবং মেডিক্যাল সুযোগ সুবিধা যা তাদের প্রদান করা হয়েছে তা লিখিত রয়েছে। এমনিভাবে অফিসারদের তথ্যাবলীও লেখা আছে। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই ফাইলগুলো ফটোস্ট্যাট না করে মূল ফাইলটিই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার ঊর্ধ্বতন অফিসার আমার এ অভূতপূর্ব সাফল্যে আনন্দে নেচে উঠবে। এই সকল ভেবে আমি তখনই লাগেজ প্যাকেট করে হোটেল বিল পরিশোধ করে বাস স্টেশনের দিকে রওয়ানা করলাম। আমার মধ্যে কিছুটা ভয়ও কাজ করছে। আল্লাহ না করুন আমার সফলতার এই মোড় না জানি কোথায় পাল্টে যায়। আমার এই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, অশোক যদি আমাকে আর নাও পায় তথাপি সে মুখ খুলবে না যেহেতু সে নিজেই এ কাজে জড়িত। এ.ডি.ও.এস ও ক্যাম্প কমান্ডেন্ট আমার ব্যাপারে কখনোই সন্দেহ করবে না। অন্তত শিয়াম তো কখনোই নয়।

আমি হোটেল থেকে বের হবার সময় সতর্কতামূলকভাবে রিসিপশনিষ্টকে বললাম যে, এক জরুরী কাজে এখনই আমি বোম্বে যাচ্ছি এবং আমার ব্যাপারে কেউ খোঁজ করতে এলেও যেন সে একই কথা বলে। বাস স্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম যে, একটি বাস সবেমাত্র স্টেশন ছেড়ে গেছে। বাসটি নিকটবর্তী একটি ব্রিজে যাত্রীদের জন্য কিছু সময় দাঁড়াবে। স্টেশন থেকে আমি দুইটি সাইকেল রিকশা ভাড়া করলাম। একটার উপর আমার লাগেজ ও অপরটিতে আমি উঠলাম। আমাকে বাস ছাড়ার পূর্বে পৌছিয়ে দিতে পারলে আমি তাদেরকে বেশি ভাড়া দেওয়ার লোভ দেখালাম। বেশি ভাড়ার লোভে তাদের সাইকেল রিকশা মোটর সাইকেল রিকশায় পরিণত হল। ব্রীজের উপর বাসকে দাঁড়ানোই পেলাম। আমি দ্রুত টিকেট কেটে সিটে বসে দোয়া করতে থাকলাম যেন কোন বিপদ আসার পূর্বেই নিরাপদ স্থানে পৌছে যেতে পারি। যদিও বিপদের তেমন কোন আশংকা নেই। আসলে এটা মানব সত্তার

বৈশিষ্ট্য যে যখন কোন বিপদজনক কাজ করি তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপদের কোন সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে এক ধরনের অজানা বিপদের আশংকা ভর করে। যা হোক, আমাদের বাস এবড়ো থেবড়ো ও ভাঙ্গা পথে ঝাঁকি খেতে খেতে চলল। আনুমানিক পাঁচ ঘণ্টা পর বাস আউরঙ্গবাদ এসে পৌঁছালো। দিল্লীগামী বাস আসার এখনও এক ঘণ্টা বাকি। আমি চোখ বুজে মথুরার টিকিট কাটলাম এবং গাড়ির অপেক্ষায় এক অন্ধকার স্থানে নীরবে বসে গেলাম। গাড়ি ঠিক সময়ে চলে এল। আমি একটি খালি সিটে বসে পড়লাম। আমি এখন একদম চিন্তামুক্ত। আমার মধ্যে শুধু এ কল্পনাই বিরাজ করছে যে, কখন ফাইল দুটো দ্রুত পাকিস্তানে গিয়ে পৌঁছবে। ধীরে ধীরে গাড়ি দিল্লীর দিকে যাচ্ছে। বিপদজনক এলাকা অতিক্রম করে আসার কারণে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলাম। যদিও বা পুরো ভারতটাই আমার জন্য ডেঞ্জার জোন (বিপদজনক এলাকা)। কিন্তু আহমদনগর থেকে এমন একটি ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসা একদম সাপের কবল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসার মত।

যাত্রা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আনুমানিক ২৪ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে। সুবহে সাদিকের সময় গাড়ি দিল্লী এসে পৌঁছল। একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমি সরাসরি লুধি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর নাস্তা করলাম। নাস্তা শেষে করনশিং হোটেলে ফোন করলাম। সেখানে অবস্থানরত ট্রান্সমিটার অপারেটর সাথীকে বিকাল চারটায় এক রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে বললাম। বাকি সাথীদের কুশলাদি তাকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলাম না। কেননা তারা হোটেলে অপরিচিত অবস্থায় আছে। শুধু এতটুকু জিজ্ঞাসা করলাম যে, সবকিছু ঠিক আছে কি না। জবাবে সে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। বারবার আমার শুধু অশোকের কথা মনে পড়ছে। সে কতখানি অসহায়ত্বের ফলেই না এত বড় বিপদ মাথা পেতে নিয়েছে। যদি তার অফিসার তার কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে জানতে পারে, তবে তার হাশর হবে। এই চিন্তার সাথেই আমার মনে পড়ে গেল, ভালবাসায় ও যুদ্ধে সবকিছুই চলে। আমাদের এজেন্সীর নিজস্ব একটি প্রবাদ আছে যে, আমরা নিরাপদ সময় যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধের সময় নিজেদের কৃতকর্মের ফলাফল দেখি। আর আমি এখন যুদ্ধে আছি।

আমি যথা সময়ে রেষ্টুরেন্টে পৌঁছে গেলাম। আমার সাথী পূর্ব থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলো। আমি সংক্ষিপ্তভাবে বললাম যে, আমার প্রথম কাজে আমি সফল হয়েছি। তার কাছে বাকি সাথীদের কথা জিজ্ঞাসা

করলাম। জবাবে সে বলল, আমরা আপনার অনুপস্থিতিতে কিছু জরুরী তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা আপনাকে বিস্তারিতভাবে সে সম্পর্কে জানাবো। আমি তাদের সকলকে একসাথে একই সময়ে একই রেষ্টুরেন্টে আসতে বললাম। আমি আমার ট্রান্সমিটার অপারেটর সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে ট্রান্সমিটারে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছে কিনা। সে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। আমি তাকে বললাম যে, এখনই হোটেলে চল, আমি বার্তা লিখে দিব। তুমি তা আমার সামনে ট্রান্সমিট করবে।

আমরা একত্রে করোনেশন হোটেলে পৌঁছলাম। বাকি সাথীরা জানতেও পারেনি যে, আমরা কখন ট্রান্সমিটার রুমে প্রবেশ করেছি। আমরা রুমের দরজা আলতোভাবে বন্ধ করে দিলাম। রুমটি হোটেলের দ্বিতীয় তলার একপাশে অবস্থিত। আমরা জানালা খুলে দিলাম। আমার সাথী ট্রান্সমিটার বের করে কারেন্টের সাহায্যে তা চালু করল। আমি বার্তা লিখলাম যে, বিশেষ প্রয়োজনে ডাক ছাড়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পাঠানো হবে। তাই দুইজন বার্তা বাহক পাঠানো হোক। একজন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে আর দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে পর্যবেক্ষণ করবে। এই বার্তা পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি উত্তর পেয়ে গেলাম। ভিন্ন ভিন্ন কোড নাম্বারেও আমি আরও কয়েকটি গোপনবার্তা পাঠালাম। আমার বার্তার জবাব এলো ভিন্ন ট্রান্সমিটারের জন্য ভিন্ন কোড নাম্বারে যা আমাকে বলে দেয়া হয়। সব সময় ট্রান্সমিটার ব্যবহারের অনুমতি নেই বরং একমাত্র ইমারজেন্সি কাজে খুব অল্প সময়ের জন্য তা ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। ভারতীয় এজেন্সিদেরও জানা আছে যে, পাকিস্তান থেকে ভারতে বার্তা ট্রান্সমিট হয়। তাদের কাছে হয়তো আমাদের দুই একটি গ্রুপের সংবাদও পৌঁছে থাকবে। যার ফলে ট্রান্সমিটার ব্যবহারে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ভারতের কাছে এমন যন্ত্রও রয়েছে যার মাধ্যমে ট্রান্সমিটারের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। বার্তা পাঠানোর পর আমি পুনরায় পূর্বের রেষ্টুরেন্টে চলে আসলাম। ট্রান্সমিটার অপারেটর সাথীকে বাকি তিন সাথীসহ সেখানে পৌঁছতে বললাম। সে আমাকে জানালো আমরা চারজন বিভিন্ন ব্যবসায়ী হিসাবে হোটেলের ডাইনিং হলে একে অপরের সাথে পরিচিত হয়েছি। পরবর্তীতে এই পরিচিতিই বন্ধুত্বে রূপ নিয়েছে। আমরা অনেক সময় হোটেল লবিতে ও রেষ্টুরেন্টে আবার কখনও বাইরে একত্রিত হয়েছি। পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পাঁচজন রেষ্টুরেন্টে মিলিত হলাম। সর্বপ্রথম আমি তাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে আমার মিশনের সফলতার কথা জানালাম। তারপর ট্রান্সমিটারধারী সাথীর কাছ থেকে লিডারশীপ ফেরত

নিলাম। এতদিন সে আমার অনুপস্থিতি বাকি তিনজনের লিডারের দায়িত্ব পালন করেছে। আমি তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও অবহিত হলাম। সবচেয়ে আনন্দের যে খবরটি তারা আমাকে দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পুরাতন দিল্লীতে তারা তিন কামরা বিশিষ্ট একটি বাসা খুঁজে পেয়েছে। বাড়িটি পতিতাপল্লী সংলগ্ন। বাড়ির মালিক একজন মুসলমান। দুতলা বাড়িটির দ্বিতীয় তলা ভাড়ার জন্য খালি ছিল। কোন হোটেলে বেশিদিন অবস্থান করলে হোটেল মালিকদের মনে সন্দেহের ও সংশয়ের জন্ম দেয়। ফলে আমাদের জন্য হোটেলে থাকা নিরাপদ নয়।

যা হোক, তারা বাড়ির মালিককে বলেছে যে, আমরা মুসলমান। ব্যবসার সুবাদে আমাদের মধ্যে পরিচয় হয়েছে। যেহেতু দিল্লীতেই আমাদের বেশিদিন থাকতে হয় সেজন্য চারজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, হোটেলে না থেকে আমরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবো। এ কথায় বাড়ির মালিক রাজি হয়ে গেল। তারা ভাড়া ও এডভান্স পরিশোধ করে আমার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলো। তাদের এই কাজটি আমার পছন্দ হলো। কেননা, শত্রুদেশে মুসলিম জাসুসদের হিন্দু হয়ে থাকা বিশেষ করে হোটেলে বেশিদিন অবস্থান করা শুধু সন্দেহেরই সৃষ্টি করে না বরং একজন মুসলমানের জন্য পরিপূর্ণভাবে হিন্দুরূপে থাকা বিপদজনক। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক সময় এমন ছোটখাট ভুলের সম্ভাবনা থাকে যার ফলে তার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। আমরা এ জাতীয় রিস্ক নিতে প্রস্তুত নই। অসতর্কতার কারণে আমার থেকেও এমন দু'একটি ভুল হয়ে গেছে, যার ফলে শত্রুর হাতে ধরা পড়তে গিয়ে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছি। যা হোক, আমি তাদেরকে বাড়ি ভাড়ার অনুমতি দিলাম। আরো একটি সফলতা যা তারা অর্জন করেছে তা হলো ভারতের আর্মি হেড কোয়ার্টারের বাইরে স্ট্যাটিক এবং মোবাইল তদারকি করে তারা কিছু সিভিলিয়ান কর্মকর্তার অফিসিয়াল পজিশন এবং অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করেছে। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা আমাদের পরবর্তী মিশনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যরা বিশেষভাবে সতর্ক থাকে, কিন্তু সিভিলিয়ান কর্মচারীরা বেপরোয়া চলাফেরা করে এবং তাদেরকে কাবু করা সাধারণত সহজ হয়। এসব তথ্য ছাড়াও তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাকে এনে দিয়েছে। এক ঘণ্টা মিটিংয়ের পর আমরা যার যার বাড়ির পথ ধরলাম এবং দুইদিন পর একই স্থানে একই সময়ে তাদেরকে সাক্ষাত করতে বললাম। আর এই দুইদিনে বাড়ি ভাড়া করে শিফট করতেও বললাম। ফাইল যদিও আমার

কাছে নিরাপদেই ছিল তথাপি একটি পেরেশানী আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যার কোন কুল-কিনারা করতে পারছিলাম না। আর তা হলো এই ফাইল দুটো যে করেই হোক বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাকিস্তানে আমার সিনিয়র-এর কাছে পাঠাতেই হবে। আর মূল বিপদটা এখানেই। বর্ডার ক্রস করার সময় আল্লাহ না করুন যদি ধরা পড়ে যায়। তবে পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি ফাইল যা অর্জনের জন্য আমার জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে হয়েছিল সে সমস্ত সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তখনো ফটোষ্ট্যাটের আবিষ্কার হয়নি। যদিও বা হয়েও থাকে তবে তা শুধুমাত্র পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতেই ছিলো। আমার কাছে কোন ক্যামেরা ছিলো না আর আমার পক্ষে এত মূল্যবান ক্যামেরা সংরক্ষণ করাটাও সম্ভব ছিলো না– যার দ্বারা আমার কাজ সমাধা করতে পারি।

তরবিলাতে চাকরিকালীন সময়ে কোম্পানীর পক্ষ থেকে আমরা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতাম যার শিরোনাম ছিলো 'আওয়াজ'। এটি জঙ্গ প্রেস রাওয়াল পিন্ডিতে ছাপা হত। লেখা হত কাঠ নির্মিত ফর্মাতে এবং ছাপা হত অফসেটে। পুস্তিকাতে ছাপানোর জন্য যে ছবি আমরা দিয়ে থাকতাম তা ফটো ফিল্মে পরিবর্তন করা হতো। যার এপাশ ওপাশ দেখা যায়। কিন্তু উপরে ছবি ধারণ করা হতো এবং এই ফটো ফিল্মই ছাপানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। আমার এই ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় দিল্লীতে এমন বই এবং পত্রিকার সন্ধান শুরু করলাম যা অফসেটে ছাপা হয়। কিছুদিন এভাবে খোঁজার পর এক বুকস্টলে গিয়ে প্রসিদ্ধ এক মাসিক বিচিত্রা পেয়ে যাই যা অফসেটে ছাপানো ছিল। সেই পত্রিকার প্রকাশনার ঠিকানা নোট করে নিলাম এবং তাদের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি মালিক ও চীফ এডিটরের সাথে কথা বলার পরিবর্তে একজন সাধারণ রাইটারের সাথে কথা বললাম। তার কথাবার্তায় ও চেহারা সুরতে তাকে মুসলমান বলে মনে হল। তাকে ফটো ফিল্ম প্রস্তুতকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে প্রস্তুতকারকের পূর্ণ নাম ঠিকানা বলে দিল। মূলত লোকটি এই অফিসের কর্মচারী ছিলো না বরং তার পৃথক দোকান ও মেশিন ছিলো। যার দ্বারা সে বিভিন্ন বই পুস্তক ও পত্রিকার ফটো ফিল্ম প্রস্তুত করত। আমি তখনই তার সাথে সাক্ষাৎ করে আর্জেন্ট ফটো ফিল্ম বানানোর কথা বললাম। আমার উভয় ফাইল দুইশত পৃষ্ঠার বেশি ছিলো। আমি তাকে ফাইলের সাইজের কথা বললে সে আমাকে বলে যে, এই ফুল সাইজের পরিবর্তে আপনি যদি পোষ্ট কার্ড সাইজে প্রস্তুত করেন তবে ভাল হবে এবং তুলনামূলকভাবে ব্যয় ও সময় কম লাগবে। আমি

দুই শর্তে তার কাঙ্ক্ষিত মজুরীর অধিক দেওয়ার কথা বললাম। প্রথমত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমার কাজ শেষ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত কাজের সময় আমি উপস্থিত থাকবো। অধিক টাকার লোভে তারা আমার উভয় শর্ত মেনে নিল। তার দোকানে মোট তিনজন সহকারী ছিল। সে আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়ার সাথে সাথে আমি লুধি হোটেলে চলে আসলাম এবং ফাইল থেকে পৃষ্ঠা বের করে তার উপরে নাম্বার লাগিয়ে দোকানে চলে গেলাম।

আমি আমার তত্ত্বাবধানে ফাইল থেকে এক এক করে কাগজ রিডিউস করালাম এবং ফটো ফিল্মের পুরো কাজ নিজে উপস্থিত থেকে তদারকি করলাম। মোটকথা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের গায়ে কাজ করার মত শক্তি ছিলো ততক্ষণ তারা এক নাগাড়ে কাজ করে গেল। সকল কাগজ রিডিউস করা হলে তা আমি আমার কাছে ফেরত নিয়ে নিলাম। অবশিষ্ট কাজ যা তারা প্রথমদিন সম্পন্ন করতে পারেনি পরদিন শেষ করল। এই কাজ করার সময় তারা আমাকে প্রশ্ন করেনি যে এগুলো কিসের কাগজ এবং এত দামে কেন ফটো ফিল্ম বানাচ্ছি, আর আমিও নিজে থেকে কিছু বলিনি। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র টাকার চমকে। এই কাজের সাথে বর্তমানে অবৈধ পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট বানানোর কাজের সাথে মিল পাওয়া যায়। আমি সমস্ত ফটো ফিল্ম সিরিয়াল অনুযায়ী একটি প্যাকেটে ভরে নিলাম এবং ফাইলের কাগজপত্রগুলো সিরিয়াল অনুযায়ী ফাইলবন্দী করলাম। এরপর ফাইল দুটিকে প্লাস্টিকে বাঁধলাম যাতে পানিতে পড়লে নষ্ট না হয়। ভালভাবে ওয়াটার প্রুফিং করার পর একটি পাটের থলের ভিতর রেখে থলেটি সেলাই করে দিলাম।

এই পর্যায়ে এসে আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম। কারণ আমি আশ্বস্ত হতে পেরেছিলাম যে, এই ফাইলগুলো আল্লাহ না করুন যদি নিরাপদে পাকিস্তানে নাও পৌছে তবে আমি ফটো ফিল্ম পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। আমি গোপন কালিতে আহমেদ নগরে আমার সফলতা ও অন্যান্য তথ্য লিখে পাঠালাম। নির্দিষ্ট সময়ে আমার সাথীরা ঐ রেষ্টুরেন্টে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা নতুন বাড়িতে বদলী হয়েছে। বাড়ির মালিক তাদের কিছু ফার্নিচার দিয়েছে, তারা নিজেরাও কিছু খরিদ করেছে। আমি চিঠিতে খরচের বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিলাম। এই মুহূর্তে আমার ও আমার সাথীদের অধিক টাকার প্রয়োজন। কেননা এখন আমাকে দিল্লীতে উচ্চস্তরের মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে এবং আমার সাথীদেরকেও নিজেদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে যাত্রা করতে হবে। এখন আমাদের বার্তাবাহক আসার অপেক্ষার পালা। তার

আসার আরও দুইদিন বাকি। এই দুইদিন আমি অশোকা ও আকবর হোটেলে কাটালাম নতুন বন্ধুর খোঁজে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বার্তাবাহক আমার সাথে মিলিত হল। সে আমাকে ইঙ্গিতে বলল যে, তার সাথে আরেকজনকে পাঠানো হয়েছে। আমি নতুন সাথীকে আমার থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাকে বাজিয়ে দেখার জন্য আমি দুলতে দুলতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সিগারেট জ্বালানোর জন্য ম্যাচ চাইলাম। সে আমাকে ম্যাচ দিল, কিন্তু বিনিময়ে সিগারেট চাইল। এটা আমাদের নতুন কোন সাথীর জন্য নির্ধারিত কোড ছিলো। সঠিক জবাব পাওয়ার পর আমি পূর্বের স্থানে ফিরে আসলাম।

এখানে উল্লেখ্য, আমি আমার একজন সাথীকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। তাকে ইশারায় এমন স্থানে দাঁড়াতে বললাম যেখানে দাঁড়ালে বার্তাবাহক তাকে দেখতে না পায়। সে তাই করল। তারপর আমার কাছে পাঠানো চিঠিটা আমি বার্তাবাহকের কাছ থেকে নিয়ে নিলাম এবং তাকে আমার সাথীর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে বললাম। আমিও পিছে পিছে চলতে থাকলাম। এদিকে নতুন সাথীটিও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পিছে পিছে চলতে থাকল। আমার সাথীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বার্তাবাহকের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দিলাম এবং আমার লেখা চিঠিটা তার হাত থেকে আমার হাতে নিয়ে নিলাম। সে তখনই বাড়ির দিকে যাত্রা করল। এদিকে চিঠির খাম নিয়ে আমি বার্তাবাহকের কাছে পৌঁছলাম এবং তার কাছে হস্তান্তর করলাম। সেই সাথে পরবর্তী সাক্ষাতের জন্য নতুন স্থান, দিন, তারিখ ও সময় বলে দিলাম। খাম নিয়ে বার্তাবাহক তখনই যাত্রা করল। নতুন সাথীটিও তার পিছু পিছু নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চলতে থাকল।

দিল্লীর যে কোন স্থানে আমি বার্তাবাহকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম এবং চিঠি আদান প্রদান করতে পারতাম। কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিলো। তাই আমরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। মোটকথা, নিরাপদেই আমাদের কাজ সমাধা করেছি। চিঠি নিয়ে আমার সাথী বাড়িতে পৌঁছে গেল। সে পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ির বাইরে এসে নির্ধারিত স্থানে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। আমি চিঠির খাম তার কাছ থেকে নিয়ে হোটেলে চলে আসলাম। চিঠিতে কিছু নতুন নির্দেশাবলী এবং ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। আমার জন্য দশ হাজার ও চার সাথীর জন্য বিশ হাজার। আমাদের যে টাকা দেওয়া হয় আমরা তার প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখি। এই সপ্তাহেরই এক বিকালে অশোকা হোটেলে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এর সূচীতে নৃত্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রোগ্রামটির জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি টিকেট নিতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, শুধুমাত্র জোড়াদের জন্য অনুষ্ঠানটিতে ঢোকার অনুমতি আছে। সুতরাং আমার একজন মহিলা সাথীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আর অশোকা হোটেলের লবিতে একজন সাথী পেয়েও গেলাম। উঁচু সোসাইটিতে প্রবেশ আকাঙ্ক্ষী দরিদ্র সোসাইটির যুবতীরা এমন ফাইভ স্টার হোটেলের লবিতে বেশির ভাগ বিকাল বেলা বসে থাকে। তারা এমন লোকদের সন্ধানে থাকে যাদের কাছ থেকে বৈকালিক খরচটাও পুষিয়ে নিতে পারে। আমি এমন এক যুবতীকেই আমার সঙ্গিনী করলাম এবং টিকিট কেটে হলে প্রবেশ করে এক টেবিলে বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নৃত্য শুরু হয়ে গেল। আকবর হোটেলে দুই তিনবার দেখেছি এমন এক যুবতীকে আমি দর্শকের সারিতে দেখতে পেলাম। তার সাথে একজন বৃদ্ধ বসা আছে। উভয়েই মদপানে মশগুল।

আমার সাথী তরুণীকে নাচতে বলায় সে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। আমরা ফ্লোরে চলে গেলাম এবং স্কয়ার ড্যান্স শুরু করলাম। বাদ্যযন্ত্রে তখন চলছিলো সুপ্রসিদ্ধ রক-এন-রোল-এর সুরলহরী। বৃদ্ধলোকটির উপর মদের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করেছে। সেও তার সঙ্গিনীসহ ড্যান্স ফ্লোরে চলে আসল। বৃদ্ধটি দ্রুত হাফিয়ে উঠল। আমি এমন একটি সুযোগেরই অপেক্ষাতে ছিলাম। পশ্চিমা প্রথা অনুযায়ী আমি বৃদ্ধের পিঠে মৃদুভাবে অঙ্গুলি বাজালাম। সে মেয়েটি থেকে দূরে সরে গেল আর আমি তার সাথে নাচতে আরম্ভ করলাম। নাচের বিরতিতে ঐ যুবতীকে আমি তার টেবিলে রেখে আসতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম এবং আমার সাথে নাচার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম। সে আমাকে তার টেবিলে বসার আমন্ত্রণ জানাল এবং আমি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে, বৃদ্ধ একজন ঠিকাদার ও যুবতী তার স্ত্রী। বাদ্যযন্ত্রের তীব্র আওয়াজ ও মদপানকারীদের উঁচু আওয়াজে আমাদের কথোপকথনে সমস্যা হচ্ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, ঠিকাদার সাহেব টেবিলে আমার উপস্থিতি ও তার বেগমের সাথে নৃত্য পছন্দ করেননি। আমি তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে উঠতে যাব এমতাবস্থায় পুনরায় ড্যান্স শুরু হয়ে গেল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অরকেস্ট্রা আমার প্রিয় বাজনা কমসেফটেম্বার বাজানো শুরু করল। আমার পা দুটো অনিচ্ছা সত্ত্বেও নড়ে উঠল।

ঠিকাদারের যুবতী স্ত্রী বাস্তবিকই আকর্ষণীয়। সে মাদকতা ভরা দৃষ্টিতে আমাকে পুনরায় নাচের আহ্বান করল। আমি সাথে সাথে চেয়ার থেকে উঠে

দাঁড়ালাম। সেও উঠে দাঁড়াল এবং আমরা ফ্লোরে এসে নাচতে শুরু করলাম। এই সুরে সাধারণত স্লো নৃত্য করা হয় এবং নৃত্যকারীদের শরীর খুব কাছাকাছি চলে আসে। কিছু পরিবেশের প্রতিক্রিয়া, কিছু মদের নেশা ও কিছু জওয়ানী জোশে আন্দোলিত সবাই। কয়েক কদম নেওয়ার পর যুবতী তার মাথা আমার বুকের উপর রাখল। আমি কানে কানে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল তার নাম আশা। আমি আশাকে বললাম যে, তোমার স্বামী তোমার সাথে আমার নাচাটা একদম পছন্দ করেননি তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। "সে পছন্দ করলেই কি আর না করলেই কি"– অর্থপূর্ণভাবে আশা জবাব দিল। আমি আশাকে বললাম যে, আকবর হোটেলে তোমাকে দুই তিনবার দেখেছি। আর তোমার রূপ-লাবণ্যে আসক্ত না হয়ে পারিনি। আজও অশোকা হোটেলে তোমাকে প্রবেশ করতে দেখে আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। লবি থেকে একজন মেয়ে নিয়ে ভিতরে চলে এসেছি। কেননা এখানে জোড়া ব্যতীত অন্য কারও প্রবেশের অনুমতি নেই। সে বলল যে, আমি তো ওকে তোমার স্ত্রী মনে করেছিলাম। বলেই হেসে উঠল এবং নেশাভরা ভঙ্গিতে বলল যে, তোমরা পুরুষরা খুবই শয়তান। আমি তাকে তাদের বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে সে বলল যে, ঠিকাদার সাহেবের প্রথম স্ত্রী মারা গেছে এবং তার মৃত স্ত্রীর গর্ভের সন্তানাদি আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি তাকে বললাম যে, হয়তো তুমি তাকে দ্রুত বুঝবে কিন্তু বাস্তব হচ্ছে আমি তোমার জন্য পাগলপারা। আমি বোম্বে থেকে এসেছি এবং লুধি হোটেলে উঠেছি। ব্যবসার খাতিরে দিল্লীতে মাঝে মাঝে কয়েক মাস থাকতে হয়। আজ পর্যন্ত কুমার রয়েছি শুধু এই জন্য যে, আমার মনের মত কাউকে খুঁজে পাইনি। ভীষণ একা আমি।

আমি চাচ্ছিলাম মেয়েটিকে দ্রুত আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে। হতে পারে যে, এমন সুযোগ আর পাব না। আমার কথার জবাবে আশা বলল যে, একা ছিলে কিন্তু এখন তো আর একা নও। সে আমার লুধি হোটেলের রুম নাম্বার চাইল এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর নাচতে নাচতে পুনরায় তার মাথা আমার বুকে ঠেকাল। যাদের এমন উঁচু সোসাইটিতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি তারা হয়তো শুনে থাকবেন যে, এশিয়া মহাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় ইংরেজরা তাদের অভিশপ্ত জীবনের ধারাবাহিকতা এখানে রেখে গেছে যা এই সমাজের মানুষেরা লুফে নিয়েছে। তারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে এতই অগ্রসর যে, পাশ্চাত্যও আজ তাদের পিছনে পড়ে গেছে। ভারতে এখন অধিকাংশ শহরবাসী স্কার্ট ও গাউন পড়ে। এরা হলো বর্তমানকালের মিডিল

ক্লাশের লোক। আপার ক্লাশের লোকেরা তো পাশ্চাত্য অনুসরণে সীমাতিক্রম করে ফেলেছে। ভারতীয় ফিল্ম আমার কথার জ্বলন্ত সাক্ষী। যে নগ্নতা আমরা পাশ্চাত্য ফিল্মে দেখতে পাই না তা আজ ভারতীয় ফিল্মে দেখতে পাই।

নাচ শেষ হবার পর আমি পুনরায় আশাকে তার টেবিলে রেখে আমার টেবিলে চলে আসলাম। আমার পেইড ফ্রেন্ড ততক্ষণে বিয়ার ও হুইস্কীয় নেশায় মাতাল। আমি এখন দ্রুত এই পরিবেশ থেকে বের হতে চাচ্ছিলাম। সেজন্য বিল পরিশোধ করে আমার ভাড়া করা সঙ্গিনীকে নতুন শিকারের তালাশে লবিতে ফেলে রেখে হোটেলে চলে আসলাম।

পরদিন সকাল এগারটায় ফোন সেট বেজে উঠল। আমি তো চিন্তিত ছিলাম যে, আমাকে কে টেলিফোন করতে পারে। ভাবতে ভাবতে রিসিভার উঠাতেই অপর প্রান্ত থেকে আশার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তার আওয়াজে বোঝা গেল যে, তার নেশা এখনও কাটেনি। কুশল বিনিময়ের পর সে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার হোটেলে আসতে চাইল। আমি তাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিলাম এবং হোটেল লবিতে আসতে বললাম। আমি ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে লবিতে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর সেও লবিতে চলে এল। তারপর আমরা কফিশপের এক কোণে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, গতরাতে তোমার স্বামীর চোখে আমার প্রতি অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, আর তুমি আজ একাই আমার কাছে চলে এসেছো? সে হেসে হেসে বলল যে, জয়চান্দের (আশার স্বামীর নাম) অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ শরাবের নেশা কাটার সাথে সাথেই উধাও হয়ে গেছে। হি ইজ নট এ হিমেন। সে আরও বলল যে, জয়চান্দ ভালভাবেই বোঝে যে তার সাথে আমার মনের মিল তখনই সম্ভব হবে যদি হি কিপস ইয়েস এন্ড আরস সাট। উঁচু সোসাইটির যুবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধ স্বামীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আশা ইংরেজির এই সাত শব্দের মাধ্যমেই বলে দিল। আমরা উভয়ে টেবিলে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও ইচ্ছা পূরণের পন্থা নিয়ে ভাবছিলাম। আমি তার হাত ধরে কোমল ও মায়াবী সুরে তার কাছে জানতে চাইলাম যে, আই বিলিভ আই অ্যাম দি ফার্স্টম্যান ইন ইওর লাইফ আদার দ্যান ইওর হাজব্যান্ড। এটা শুনে সে হেসে উঠে বলল যে, ইফ ইউ থিংক সো ইউ আর এ ফুল। তারপর সে নিঃসংকোচে বলতে শুরু করল, আমার স্বামী টেন্ডার নেওয়ার জন্য অফিসার পর্যায়ের লোকদের পার্টি করে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সে আমাকে পেশ করে থাকে। এই লোক তার জীবন নদী পাড়ি দিতে গিয়ে বয়সের এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, শারীরিক দিক দিয়ে

বেকার হয়ে গেছে। আমার পিতাও একজন ঠিকাদার ছিলেন। কোন এক ঠিকাদারীতে তার এমন ক্ষতি হয় যে, সামাল দিতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে জয়চান্দ আর্থিক সহযোগিতা করে আমাকে হাতিয়ে নেয়। যদি জয়চান্দ এই কাজে আমাকে ব্যবহার না করত তবে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমি ভাল স্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতাম। কিন্তু অর্থের জন্য সে আমাকে বিক্রি করতে শুরু করেছে। এখন আমাদের উভয়ের মাঝে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে যে, তার পক্ষ হতে আয়োজিত পার্টিতে আমি তার জন্য টেন্ডার অর্জনের চেষ্টা করব এবং বিনিময়ে সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। শরাবের নেশায় অনেক সময় তার রাগ চলে আসে কিন্তু আমি তাকে আমাদের শর্তগুলো মনে করিয়ে দিলে সাথে সাথে সে চুপ হয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমি যখন তাকে লাঞ্চের জন্য ডাইনিং হলে যেতে বললাম তখন সে বলল যে, কফিশপে স্নেক্স দ্বারাই তার পেট ভরে গেছে। সে বারবার আমাকে আমার কামড়ায় চলে যাবার তাগাদা দিচ্ছে। আর আমি প্রতিবারই তার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। পাঠকদের নিকট আমি বলতে চাই যে, আমি কোন মুত্তাকী বা ফেরেশতা নই। একজন রূপসী নারীর প্রকাশ্য নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আমি নারী চরিত্রের ব্যাপারে অবগত ছিলাম যে, যতক্ষণ না এ জাতীয় নারীর চাহিদা পূরণ হয় ততক্ষণ তারা চাহিদা পূরণের জন্য শুধু ছটফটই করে না বরং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন বাজি রেখে যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যদি একবার চাহিদা মিটে যায় তবে ঐ ব্যক্তিকে সে নিজের বশীভূত ব্যক্তিদের তালিকায় শামিল করে নতুন কোন এ্যাডভেঞ্চার-এর সন্ধানে নেমে পড়ে। সে আমাকে তার জীবনের যে দিক সম্বন্ধে বলেছে সে অনুযায়ী সে আমার অনেক কাজে আসতে পারে। তার পীড়াপীড়িতে এক পর্যায়ে আমি তাকে বললাম যে, আমি রিসিপশনে গিয়ে বলে আসি কেউ যেন আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিস্টার্ব না করে এবং কোন কল যেন আমাকে ট্রান্সফার না করে। কিন্তু রিসিপশনে গিয়ে ৫০ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলি যে, ঠিক পনের মিনিট পরে সে যেন আমাকে ফোন করে এবং ফোনে আমার আওয়াজ শোনামাত্রই যেন ফোন রেখে দেয়। এই ব্যবস্থা করে আমি আশার কাছে চলে আসলাম।

কামরায় প্রবেশ করা মাত্রই নিঃসংকোচে সে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে আমার বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল। তার আঁখি ও রূপ-লাবণ্যের প্রকাশ্য নিমন্ত্রণ

গুনাহের দাওয়াত দিচ্ছিলো। আমি তাৎক্ষণিক আমন্ত্রণ ঠেকানোর জন্য তাকে বললাম যে, এমন সুযোগের সদব্যবহার করা দরকার। যে কথা সেই কাজ। আমি টেলিফোনে আমার রুমে এক বোতল স্কাচ ও হুইস্কি এবং আইসক্রিম পাঠাতে বললাম। তারপর ফোন রেখে ইশারায় আশাকে বললাম যে, আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আমি বাথরুম থেকে তখনও বের হইনি এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ফোন আশা উঠাল এবং রিসিভার টেবিলে রেখে দিল। আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে ফোন ধরলাম এবং রিসিপশনিস্ট-এর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আমার আওয়াজ শোনা মাত্র সে ফোন রেখে দেয়। কিন্তু আমি একতরফাভাবে বলতে শুরু করলাম যে রামিশ সাহেব, আপনি? আপনি আসার কি প্রয়োজন ছিলো, আমাকে ফোন করে দিলেই তো আমি উপস্থিত হয়ে যেতাম। আচ্ছা, আপনার পার্টিও কি আপনার সাথে আছে? আপনি দয়া করে লবিতে বসেন আমি এক্ষুণি আসছি। এই বলে আমি ফোন রেখে দিলাম। আশা আধবোজা চোখে আমাকে দেখছিলো। আমি তাকে বললাম যে, কেয়ামত হয়ে গেছে। আমার চা ব্যবসার পাঞ্জাব ও হরিয়ানার এজেন্ট নিজেদের পার্টি সাথে করে দিল্লীতে এসেছে। আমি রিসিপশনিস্টকে বললাম কি আর ব্যাটা করল কি? আমি কামরায় আছি সে কথা সে তাদের বলে দিয়েছে। এখন আমাকে তাদের সাথে অফিসে যেতে হবে।

আমার কথা শুনে আশা নিরাশ হয়ে গেল। সাথে সাথে আমি তাকে আগ বাড়িয়ে বুকে চেপে বললাম আজ তো খেলা জমে উঠার আগেই বাধা পড়লো। কিন্তু সামনে আজকের ক্ষতি পূরণ করে দিবো। আশা তার মেকআপ ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। আমি তাকে বললাম, যদি তুমি তোমার ফোন নাম্বার আমাকে দাও তবে ফোনে তোমাকে নতুন প্রোগ্রামের সময় জানিয়ে দিবো। আশা চুপ করে টেবিলে রাখা প্যাডে তার ফোন নাম্বার লিখে দিল। হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করল, ভিনোড আই প্রমিজ আই উইল উইন ইউ। দ্বিতীয়বারের মত সে মেকআপ ঠিকঠাক করে কামরা থেকে বের হয়ে লিফটে করে নিচে চলে গেল। আমি তাকে বিদায় জানানোর জন্য বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে আসলাম।

পার্কিংয়ে রাখা বিদেশী কনভারটাইবল গাড়িতে গিয়ে সে বসে পড়ল এবং দ্রুত ড্রাইভিং করে চলে গেল। এরপর আমি কামরায় ফিরে আসলাম এবং শুয়ে পড়লাম। আশার সাথে আমি আমার সম্পর্ক শুধু ঠিক রাখা নয় বরং বৃদ্ধি করতে চাচ্ছিলাম। এ জাতীয় নারীদের সাথে মডার্ণ সোসাইটির প্রত্যেক স্তরের মানুষের সম্পর্ক হয়ে থাকে। আশার মাধ্যমে আমি আমার জন্য প্রয়োজন

এমন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলাম। মোটকথা, আমার ইচ্ছা ছিলো আশাকে আমার মূল্যবান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা। সেদিন বিকাল বেলা আমি হোটেলেই কাটালাম। শুধুমাত্র কাপড় তৈরির জন্য বের হলাম। আমি সার্বিকভাবে মডার্ণ সোসাইটিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হলাম যেখানে আমি সিনিয়র সিভিল ও ফৌজি অফিসারদের সাক্ষাত পাবো। এদিকে আমার সাথীরাও বেকার বসে নেই। তারা আর্মি হেড কোয়ার্টারে দায়িত্বশীল সিভিল অফিসার এবং করণিকদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকল। সে সকল তথ্য আমি আমার ডায়রীতে বিশেষ কোড নাম্বারে লিখে রাখলাম।

একদিন লুধি হোটেলে আমি এক আমেরিকান যুগল দেখতে পেলাম। তারা কাঠমান্ডু যেতে ইচ্ছুক ছিলো। আমি তাদের ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, তারা প্রতিরাতেই হোটেলের বাগানের এক কোণে অন্ধকারে বসে আড্ডা জমায়। কোন এক রাতে আমি লতাগুল্মের আড়ালে লুকিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করলাম। আস্তে আস্তে তাদের কাছে পৌঁছতেই চরসের গন্ধ পেলাম। আমি হঠাৎ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় বললাম যে, এখানে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা একদম নিষেধ আর তোমরা কিনা তা প্রকাশ্যেই করছো। আমার কথা শুনে তারা ভড়কে গেল। তখন আমি শান্তভাবে তাদের বললাম, তোমাদের ধরিয়ে দিতে আমি মোটেও আগ্রহী নই। সত্যি কথা বলতে কি, আসলে আমার দৃষ্টি ছিলো তাদের রোলার ফ্লিক্স ক্যামেরার দিকে। আমি তাদেরকে বললাম যে, আমি এই ক্যামেরা খরিদ করতে চাই। তারা এতো ভীত ছিলো যে, তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। আমি নামমাত্র মূল্যে ক্যামেরাটি খরিদ করলাম। তারপর সাক্ষী হিসাবে দু'জন লোকের দস্তখত নিলাম যাতে পরবর্তীতে ঝামেলা করতে না পারে। তারা এমন ভয়ই পেয়েছিল যে, পরদিন হোটেল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। আমি ক্যামেরাটি আমার দুই নাম্বার সাথী অর্থাৎ ট্রান্সমিটার অপারেটরকে দিয়ে দিলাম। আর্মি হেড কোয়ার্টারের যেসব সিভিল কর্মচারীর পিছু তারা নিয়েছে তাদের ছবি, তাদের পরিবারের সদস্যের ছবি তুলতে ও ছবির পিছে নাম লিখে আমাকে দিতে বললাম। এছাড়া অতিরিক্ত তথ্য উদ্ধার করলে সেগুলো আমাকে লিখে জানাতে বললাম। তাদের টার্গেট থেকে হেড কোয়ার্টার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারী মেথরগুলোও বাদ গেল না।

ভারতে শূদ্র অর্থাৎ হরিজনরা হাজার বছর ধরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে আসছে। তাদের ধারণা ছিলো স্বাধীনতার পর জাতিভেদের বিভেদ মিটে যাবে কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। ইংরেজদের শাসন আমলেও তাদের এতোটা অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়নি যতটা তারা স্বাধীনতার পর

হয়েছে। স্বাধীনতার পর তাদের নাম হরিজন দেওয়া হয় বটে। কিন্তু তাদেরকে সমস্ত এলাকা থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। একটি লাল পতাকা তাদের বস্তিতে উড়ানো আবশ্যকীয় করা হয়। তাদের কূপ এবং মন্দির পৃথক করে দেওয়া হয়। কোন হরিজনের এমন সাহস নেই যে, সে উঁচু জাতের হিন্দুদের কূপ থেকে পানি পান করবে এবং তাদের মন্দিরে যাবে। কিন্তু এই দূরাবস্থা তারা বেশিদিন মেনে নেয়নি। তাই হরিজনরা ফুলন দেবীর মত ডজন ডজন ডাকাতের বাহিনী প্রস্তুত করে এবং নিজেদের নির্যাতনের বদলা অক্ষরে অক্ষরে নিতে থাকে। সে কারণেই হিন্দুরা এখন হরিজনদের খুব কমই বিশ্বাস করে।

ভারতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ হরিজনরা ছাড়াও খ্রিষ্টানরা করে থাকে। আমি এই নিচু জাতের মানুষদের দ্বারা বড় ধরনের কোন কাজ করার পরিকল্পনা করছিলাম। সেজন্য তাদের ব্যাপারে অধিক তথ্য জানার জন্য আমার চার সাথীকেই নিয়োগ করলাম। এমন সময় আমার কাছে আশার ফোন এল। আমি তাকে ফোনে ফোনে আমার ব্যাকুলতা ও ভালবাসার এমন প্রমাণ পেশ করলাম যে, সে দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে উঠল। আমি তাকে বললাম যে, আমার চায়ের অনেক বড় একটি চালান বোম্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল শীতের কারণে চা বেশিদিন ষ্টোর করে রাখা যাবে না আর আমি চা এই এলাকাতেই বিক্রি করতে চাই। যার কারণে আমাকে আরও কয়েকদিন তোমার থেকে দূরে থাকতে হবে। কাজ শেষ করেই তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার অথৈ সাগরে হারিয়ে যাবো।

একদিন দুপুরের কিছু পূর্বে সার্ভিস ক্লাবে চলে গেলাম। সেখানে রিসিপশন রুমের বোর্ডে অফিসারদের নাম ও র‍্যাংক লেখা ছিলো। আমি তড়িঘড়ি সেগুলো নোট করে ক্লাবের সেক্রেটারীর কামরায় চলে গেলাম এবং নোটকৃত নামের মধ্য হতে এক কর্ণেলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে সে বলল যে, তিনি তো এখন ডিউটিতে আছেন। আপনি সন্ধ্যা সাতটার পর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম যে, আমি কর্ণেল সাহেবকে ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এক বন্ধুর রেফারেন্সে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তারপর সেক্রেটারী আমাকে বলল, সন্ধ্যাবেলায় তিনি এখানে থাকবেন এবং তিনি আসলে আমাকে কর্ণেলের কাছে নিয়ে যাবে। সেদিন বিকাল বেলা আমি ভালভাবে ড্রেসআপ হয়ে ক্লাবে চলে গেলাম। বিকাল বেলা সেক্রেটারী তার অফিসে ছিলো না। ফলে, আমি ক্লাব চত্বরে পায়চারি করতে লাগলাম। ক্লাবে মেম্বারদের আগমন শুরু হয়ে

গিয়েছে। পায়চারী করাকালীন আমি লক্ষ্য করলাম, সিভিল ইউনিফর্ম পরিহিত কিছু যুবক অফিসার ক্লাব চত্বরে পৃথক পৃথক গ্রুপে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দূরে মধ্য বয়সীদের পৃথক একটি গ্রুপ রয়েছে। আমি দেখতে পেলাম যে, তাদের থেকে একদম পৃথক চত্বরের দ্বিতীয় কর্ণারের নিকট লম্বা গোঁফধারী মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক এক চেয়ারে বসা। তার সামনের টেবিলে উন্নতমানের বিদেশী হুইস্কি। টেবিলের অপর পাশে একটি খালি চেয়ার পড়ে আছে। আমি দুলতে দুলতে সেদিকে গেলাম। সে ধীরে ধীরে শরাব পান করছিলো। তার পিছনে সামান্য দূরে এক ব্যক্তি যার আকৃতি আমার কাছে ব্যাটম্যান-এর মত মনে হল, সে ভদ্রভাবে দাঁড়ানো আছে। আমি তার থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি এদিক ওদিক সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম আবার কখনো বা আমার ঘড়ি দেখলাম। আমি আসলে বোঝাতে চাইলাম যে, আমি কারো অপেক্ষায় আছি।

কর্ণেল লোকটির অবস্থা দেখে আমার জেনারেল গোল হাছানের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে চাকরিকালীন সময়েও ফ্লিশমেন হোটেলে থাকতেন এবং প্রতি সন্ধ্যাতেই লেনে আড্ডা জমাতেন। এছাড়াও করাচীতে ব্রিগেডিয়ার নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন যিনি কে.ডি.এ.-এর সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিও করাচীর জিমখানাতে নির্জনে একইভাবে বিকাল কাটাতেন। এখানে একটি বিষয় পাঠকদের অবগত না করে পারছি না। আর তা হলো জেনারেল গোল হাছানই প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহইয়া খানের কর্ণমূলে রিভলবার ঠেকিয়ে পদচ্যুত করিয়েছিলেন এবং ভুট্টোকে আফগানিস্তান থেকে ডেকে এনে চীফ মার্শাল এডমিনিস্টেটর ও প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিলেন। ছয় সপ্তাহ সেনা প্রধান থাকার পর প্রেসিডেন্টের সাথে মতবিরোধের কারণে তাকে উক্ত পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই দু'জন চিরকুমার ছিলেন। আমার মনে হতে লাগল যে, হয়তো বা গোঁফধারী লোকটিও একাকী জীবনযাপন করছেন। আমার ধারণা একশ' ভাগ সত্য প্রমাণিত হলো। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হবার পর তিনি আমাকে ডাকেন এবং তার কাছে যাওয়ার জন্য বলেন। তার কথার দাপটের মাধ্যমে আমি অনুমান করলাম যে, তিনি ব্রিগেডিয়ারের চেয়ে কোন অংশে কম নন। আমি তার নিকটে গেলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন- আর ইউ ওয়েটিং ফর সাম ওয়ান? আর ইউ ফ্রম আর্মড ফোরসেস? তুমি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছ, তুমি কি সেনাবাহিনীর সদস্য? জবাবে আমি তাকে বললাম, জনাব! আপনি অর্ধেক সঠিক বলেছেন, আমি আমার এক সাথীর অপেক্ষায় আছি কিন্তু আমি একজন সিভিলিয়ান আর

আমার সাথী একজন পরিপূর্ণ সৈনিক। তিনি আমার আপাদমস্তক ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে বলে উঠেন- হোয়াট এ স্যাম! তোমার মত মানুষ সেনাবাহিনীর সদস্য নয়? যদি তুমি চাও তবে আমার সাথে বসতে পারো। আমি সাথে সাথেই খালি চেয়ারে বসে পড়লাম। আমি তাকে আমার পরিচয় দিলাম। তিনিও আমাকে তার পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টারে কাজ করেন। আমি তাকে বললাম, আপনি কিন্তু একটি কথা এখনও আমাকে বলেননি যে, আপনি অবিবাহিত। তিনি আমার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একথা তুমি কিভাবে জানলে? আমি তাকে বললাম, স্যার, দিস ইজ অবজারভেশন এন্ড ফেস রিডিং। আমি তার চেহারার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাটা বললাম। আমি আরও বললাম যে, আপনি যে সুউচ্চ মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী তা আপনার চেহারাই বলে দিচ্ছে। আপনি জীবনে একবার প্রেম করেছেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে সৈনিক জীবনের ডিসিপ্লিনের সাথে আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আপনার অতীত ব্যথা যখন মনের মধ্যে জেগে উঠে তখন আপনি মদে মাতাল হয়ে সে ব্যথাকে ভুলে থাকতে চান।

কর্ণেল সাহেব হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমার মনে হলো তিনি অনেক কষ্টে নিজের অশ্রু সংবরণ করলেন। ইজি হয়ে বসে এক পিগ বানিয়ে আমার সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সোডা না পানি? আমি জবাব দিলাম, অন দি রোকস। তিনি বরফের কয়েক টুকরা আমার গ্লাসে ঢেলে দিলেন। কর্ণেল আমার শেষ কথার কোন জবাব না দিয়ে বললেন যে, আমি তোমার সাক্ষাতে আনন্দিত, তোমার মন যখনই চাইবে বিকেল বেলা আমার কাছে চলে আসবে। ইন দি ভেরী লিমিটেড সার্কেল অ্যাট মাই ফ্রেন্ডস ইউ আর এন এডিশন। কিছুক্ষণ পর কর্ণেল সাহেব ব্যাটম্যানকে ডাকার জন্য পিছনে ঘুরে তাকাল আর সেই সুযোগে আমি আমার গ্লাসের মদ লেনের ঘাসের উপর ঢেলে দিলাম। তারপর তার কাছে ওজর পেশ করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। এই কর্ণেলটির নাম হল শংকর। পরবর্তীতে আপনারা জানতে পারবেন যে, এই কর্ণেলের মাধ্যমে আমি কতখানি সফলতা অর্জন করেছি।

আমি ক্লাব সেক্রেটারীর অফিসে গেলাম। সে তখন অফিসে উপস্থিত ছিলো। সে আমাকে নিয়ে ক্লাব বারের সোফাতে বসা এক গ্রুপের দিকে নিয়ে গেল এবং এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করে দেখিয়ে বলল যে, ঐ তো কর্ণেল মদন বসে আছেন। তারপর তার কাছে গিয়ে বলল যে, স্যার! এই ভদ্রলোক

দিনের বেলাতেও আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। কর্ণেল মদন জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাল। আমি তাকে বললাম যে, আমি জুশির রেফারেন্সে আপনার কাছে এসেছি। জুশির নাম আমি নিজেই বানিয়েছিলাম। কেননা ভারতে নামের শেষে জুশি এভেইলেবেল ব্যবহার করা হয়। কর্ণেল সাহেব কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করতে থাকেন। আমি তাকে বললাম, আমার সাথে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সম্পর্ক। আমি জাতিতে চোপড়া। কর্ণেল সাহেব হেসে ফেললেন এবং আমার সাথে আনন্দচিত্তে করমর্দন করলেন এবং বলে উঠেন জুশি ও আমি যশোরে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান বাংলাদেশের এক সেনানিবাস যেখানে '৭১ সালে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) একত্রে ছিলাম। কর্ণেল সাহেব আমাকে সোফাতে বসাল। আমি তখন তাকে আমার ব্যবসার কথা বললাম। কর্ণেল সাহেব আমাকে শরাব পানের দাওয়াত দেন। আমি তাকে তার সাথে আমার সাক্ষাতের কারণ হিসাবে বললাম যে, দিল্লীতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বিশেষ করে বিকেল বেলা কাটানো তো এক আজাবের ব্যাপার। যার কারণে আজ দিনের বেলাতেও আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলাম। আর এখনও একই উদ্দেশ্যে এসেছি। প্রতি উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, বি মাই গুয়েস্ট। আমি এখানে ক্লাবেই থাকি। আর আমি ক্লাব সেক্রেটারীকে তোমার কথা বলে দিচ্ছি। যখনই তুমি আসবে তোমাকে যেন আমার মেহমান হিসাবে আপ্যায়ন করে। এর পাশাপাশি সে কানে কানে আমাকে বলল যে, যখনই একা আসবে অবশ্যই বিল পরিশোধ করবে। আমি বললাম, আই উইল এন্ড থ্যাংকস ফর ইওর হসপিটালিটি। কর্ণেল তার বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। আমার আগমনে তাদের আলোচনার যে ধারাবাহিকতা থেমে গিয়েছিলো তা আবার শুরু হলো। আমিও আগ বাড়িয়ে তাদের সাথে শরীক হতে থাকলাম। আমি চাচ্ছিলাম এর দ্বারা অফিসারদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে ও ফ্রি হতে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথে একাকার হয়ে গেলাম।

ক্লাবে অফিসাররা কেউ কেউ ইভিনিং জ্যাকেট আবার কেউ ইভিনিং স্যুট পরে আসছে। এতে অফিসারদের চেনা সহজতর। অফিসার চাই সে যে র‍্যাংকেরই হোক না কেন বারের গেট দিয়ে প্রবেশ করেই এটেনশান হয়ে যাচ্ছে। অফিসারদের পাশাপাশি কিছু সিভিলিয়ানও আসছে। ক্লাবের ভিতরের চেয়ে লেন বেশি সুন্দর। লেনে ডজন ডজন চেয়ার রেখে দেওয়া হয়েছে এবং তরুণ অফিসার ও যুগলিরা সেখানে বসছে। কর্ণেল মদন আনুমানিক এক

ঘণ্টা পর আমাকে কার্ড রুমে নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করে বললাম যে, আমি কার্ড খেলতে পারি না বিশেষ করে রাশি খেলা। কর্ণেলের সাথে দুই তিনজন সাথীও উঠে পড়লো। এরা সকলেই মেজর, লেফটেনেন্ট ও কর্ণেল পর্যায়ের। যারা সেখানে বসা ছিলো আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম।

ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে আমাকে জানানো হয়েছে যে, ক্যাপ্টেন থেকে নব মেজর পর্যন্ত অফিসাররা খুবই সতর্ক হয়ে থাকে। কিন্তু মেজরের উপরের র‌্যাংকের অফিসাররা ততটা সতর্কতা অবলম্বন করে না। যদি তাদের সাথে বন্ধু হয়ে যায় তবে তরুণ অফিসাররাও আর সিনিয়র অফিসারদের সাথে উঠবসকারীদের উপর সন্দেহ করে না। আমি বেশ কিছুক্ষণ গ্লাস হাতে ক্লাবের এক কোণ হতে অপর কোণে টলতে থাকলাম। তারপর আপন হোটেলে ফিরে আসলাম।

দিল্লীতে বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছে। আকাশ মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখানে পাঠকদের খেদমতে কিছু কথা বলতে চাই। তাহলো, ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির এ কাহিনী সম্পূর্ণ বাস্তব। এটা কোন মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী নয়। আর কাহিনীর শোভাবর্ধন কল্পে এখানে কোন মিথ্যা ছলচাতুরির আশ্রয়ও গ্রহণ করা হয়নি। আমরা পনের সদস্যের যে টিম বিশেষ মিশন নিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলাম কোন সাধারণ মানুষ ছিলাম না। এ তো আমাদের আবেগ ছিল, যার জন্য নিজেদের জীবন মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছি। ভারতে সফলতার পাশাপাশি আমরা কিছু ব্যর্থতারও সম্মুখীন হয়েছিলাম। সে আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে। দিল্লীতে আশার সাথে সাক্ষাৎ, সরোসাজ ক্লাবে কর্ণেল শংকর ও কর্ণেল মদনের সাথে সাক্ষাৎ, আমার সাথীদের আর্মি হেড কোয়ার্টারের সিভিল কর্মচারীদের অফিসিয়াল ও পারিবারিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা প্রভৃতি কাজের জন্য এত অধিক সংখ্যক দৌড় ঝাঁপ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিলো না যে, আমরা কেবলমাত্র হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করব বরং আমাদের লক্ষ্য ছিলো সেখানে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। আমরা সর্বদাই সুযোগের সন্ধানে থাকতাম। কোথাও সুযোগ না মিললে অন্য কোথাও তার খোঁজ করতাম। আমার কাজের কৌশল ছিলো শত্রু বা লক্ষ্যবস্তুতে চতুর্দিক থেকে হামলা করা। এতে শুধু সময়ের সাশ্রয়ই নয় বরং শত্রুর কোন না কোন দুর্বল পয়েন্ট পাওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা ছিলো। আমাদের নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করা ও নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিলো। এজন্য আমরা

দু'একটি নয় বরং শত শত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চাই তা উচ্চস্তরের হোক বা নিম্নস্তরের হোক। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা উন্নতির চরম পর্যায়ে এবং নীচুতার অথৈ গভীরে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত ছিলাম।

আপনারা হয়তো পাগল বলতে পারেন। কিন্তু মাতৃভূমির ভালবাসা ও মিল্লাতের দূরাবস্থার চিত্র মনের মাঝে বিরাজমান ছিলো বিধায় উদ্দেশ্য সাধনে আমরা সদা প্রস্তুত ছিলাম। পরদিনও প্রবল বর্ষণ হলো। আমি পরবর্তী কয়েকদিন সার্ভিস ক্লাবে কাটালাম। কিন্তু সফলতার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। গোঁফধারী কর্ণেল শংকরের সাথেও লেনে দুবার সাক্ষাৎ করেছি। তার সাথে আমার নৈতিক মতবিরোধ ছিল। তার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই তাকে কিছুটা সতর্ক মনে হচ্ছিলো। হয়তো সে বুঝতে পেরেছিলো যে, আমি তার অতীত সম্পর্কে অবগত এবং তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা রাখি। তবে সে আমার সঙ্গ দ্বারা আনন্দিত হত এবং ভবিষ্যৎ সাক্ষাতের জন্য তাগিদ করত। তার সতর্কাবস্থার কারণে আমি কখনো তার সাথে হেড কোয়ার্টারের ব্যাপারে আলোচনা করিনি।

একদিন সন্ধ্যা সাতটায় তার বাসায় উপস্থিত হলাম। সে বাসাতেই ছিলো। দরজা নক করলে তার গেটকিপার তাকে আমার ব্যাপারে জানাল এবং আমাকে সিটিং রুমে বসাল। কর্ণেল শংকরের বাসা দুই রুম বিশিষ্ট ছিল। বেড রুম এবং সিটিং রুম। কিছুক্ষণ পর কর্ণেল সাহেব উর্দি পরে রুম থেকে বেরিয়ে আসলেন। সে আমাকে জানাল যে, তাকে এক জরুরি মিটিংয়ে যোগ দিতে হেড কোয়ার্টারে যেতে হচ্ছে। ফলে আমাকে সময় দিতে পারছেন না। তার হাতে একটি ব্রিফকেস। আমার মনে হলো, না জানি এই ব্রিফকেসে কত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রয়েছে। সংক্ষিপ্ত কথার পর আমরা দু'জনই রুম থেকে বেরিয়ে আসলাম। পার্কিংয়ে হেড কোয়ার্টারের নাম্বার প্লেট লাগানো একটি হিন্দুস্থানী গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। কর্ণেল আমার সাথে করমর্দন করে গাড়ি করে তার গন্তব্যে চলে গেলেন। আমি যদি আজকের বিকেল সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই জানতাম তবে ব্রিফকেস উদ্ধারের জন্য সাথীদের নিয়ে কর্ণেলকে হত্যা করতেও দ্বিধা করতাম না। কিন্তু তা এখন কল্পনা বৈ কিছু নয়। এই ব্রিফকেস উদ্ধারের জন্য এখন আমাকে সিংহের শক্তি ও শিয়ালের ধূর্ততা একসাথে ব্যবহার করতে হবে। আমি কর্ণেল সাহেবের গেট কিপারের মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য হাসিলের পরিকল্পনা করলাম।

এই ক'দিন আমি আমার সাথীদের সাথে মাত্র একবার সাক্ষাৎ করেছি। তারা সকলেই যার যার কাজে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু তারপরও সন্তোষজনক

কোন কাজ হয়নি। আমরা হিসাব করলাম যে, কত কম সময়ে আহমেদ নগরের ফাইলগুলো পাঠিয়েছি। এই সফলতার পর সিনিয়র সম্ভবত আমাদের বিশেষ ইমেজ তৈরি করে থাকবেন। তাই একে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা জোর তদবীর চালালাম। আমাদের বার্তাবাহকও আসার মাত্র কয়েকদিন বাকি। যার ফলে ফাইল হাসিলের সফলতার বিনিময়ে আমাদের সিনিয়রদের প্রতিক্রিয়া দেখার ইচ্ছা হল। আমার ইচ্ছা হল এবারও বার্তাবাহকের মাধ্যমে অধিক তথ্য পাঠাব। এজন্য আমি কর্ণেল শংকরের গেটকিপারকে একবার যাচাই করতে চাইলাম। যদি সে ধরা না দেয় তবু ঘি তো বের করতেই হবে। সোজা আঙ্গুলেই হোক আর বাঁকা আঙ্গুলেই হোক। এরই মধ্যে আশা ফোন করল এবং আমাকে বিকাল চারটায় আকবর হোটেলের কফিশপে তার সাথে দেখা করতে বলল। আমি যথাসময়ে আকবর হোটেলে পৌছে গেলাম। কফিশপে আশাকে সুঠাম সুন্দর এক যুবকের সাথে দেখতে পেলাম। এই অবস্থা দেখে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম– তাদের টেবিলে যাবো কি না। এমতাবস্থায় আশা আমাকে ডাক দিল এবং সেই যুবকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ছেলেটি এম.এস.এস.-এর এক ব্রিগেডিয়ারের ছেলে, শিক্ষিত গ্রাজুয়েট। আমার মনে হলো আশা হয়তো আমার আরও নিকটবর্তী হওয়ার জন্য ছেলেটিকে দেখিয়ে আমাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে অথবা তার স্বামীর দ্বিতীয় কোন টেন্ডার অর্জনের চেষ্টা করছে। এক সময় তরুণটি ফোন করার জন্য লবিতে গেল। এ সময় আশা আমাকে জানাল যে, আমার দ্বিতীয় চিন্ত টাই ঠিক। আমি তার সাথে আনুমানিক আধা ঘণ্টা বসে থাকলাম। এই সময়ে আশা কখনো যুবকের সাথে কানাকানি কথা বলল আবার কখনো আমার হাত নিঃসংকোচে তার হাতে নিয়ে নিল। সে ছেলেটিকে আমার চায়ের ব্যবসা সম্পর্কে অতিশয় বাড়িয়ে বলল। আমি বুঝতে সক্ষম হলাম যে, আশা আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে যেন আমাদের উভয়ের কাছ থেকে স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে। আশাকে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনকার মত আমি তার টেবিল থেকে উঠে পড়লাম।

আশার সাথে পরিচয়ের পর থেকে তার পারিবারিক জীবনের যা কিছু সে আমাকে বলেছে আমার ধারণা অনুযায়ী তার কারণ তার বৈবাহিক জীবনের নিরাশা ও তার স্বামী কর্তৃক তাকে শুধুমাত্র টেন্ডারবাজির কাজ উদ্ধারে ব্যবহার বৈ কিছু নয়। জয়চান্দের মত বৃদ্ধের সাথে বিবাহ একমাত্র তার বাবার আর্থিক অপারগতা বটে। কিন্তু জয়চান্দও এই সুযোগে তাকে তার ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। ফলে এই শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী নিজের স্বামী ও

সমাজবিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। আমি যখন তাকে বলেছিলাম যে, আমি অবিবাহিত ও বোম্বের একজন বড় ব্যবসায়ী এবং ওর সৌন্দর্যে আমি পাগল হয়েছি, হতে পারে সে তখন আমাকে জড়িয়ে তার ভবিষ্যৎ ভাবতে শুরু করেছিলো। মোটকথা, আশার চাল-চলনে আমি বুঝতে পারলাম যে, বর্তমানে সে আমার কোন কাজেই আসবে না। হোটেলে আসার পথে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আশাকে বাদ দিয়ে আমাকে নতুন মাধ্যম সন্ধান করতে হবে। আর আমার নতুন মাধ্যমের তালিকাতে যাদের আমি শামিল করেছিলাম তারা হলো কর্ণেল শংকরের গেটকিপার, অশোকা ও আকবর হোটেলে বিকাল অতিবাহিতকারী সামরিক অফিসার ও তাদের বেগম প্রমুখকে।

পরদিন সকাল বেলা আমি পতিতাপল্লীতে গেলাম এবং সাথীদের বাসার সামনে বিশেষ আওয়াজ দিলাম। তারপর বড় সড়কে ফিরে আসলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রান্সমিটার অপারেটর সাথীটি আমার কাছে আসলো। আমি তাকে বাকি সাথীসহ বিকাল বেলা এক রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে বললাম– যেখানে সবার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যথাসময়ে তারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জানালো যে, তারা কাজের তেমন কোন উন্নতি করতে পারেনি। বৃষ্টির কারণে দিল্লীর রাস্তাঘাটে লোকজনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এজন্য কারও পিছু নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা এতে কারও মনে সন্দেহের জন্ম দিতে পারে।

পাঠকবৃন্দ, গোয়েন্দা কাহিনী এবং ফিল্মে আপনারা যা কিছু পড়ে থাকেন ও দেখেন তা শুধু লেখকের কল্পনা যার কোন বাস্তবতা নেই। কিন্তু বাস্তবে জাসুসী এক ক্লান্তিকর ও কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাসকে মাস পরিশ্রম করার নাম। নিজেদের অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময় এখানে ব্যর্থ হতে হয়। ১১৮৫ দিন যা আমি ভারতে ও নেপালে কাটিয়েছি তন্মধ্যে কখনো সপ্তাহকে সপ্তাহ বা মাসকে মাস আমাকে লক্ষ্যার্জনে ব্যয় করতে হয়েছে। প্রতিদিন এক নতুন সফলতার উদ্দামতা আপনি শুধু কল্পকাহিনী ও ০০৭ প্রকারের ফিল্মেই পেতে পারেন। সাথীদের সাথে মিটিংয়ের তৃতীয় দিনে বার্তাবাহক আসার কথা। নির্দিষ্ট সময়েই সে আসল। তার থেকে ডাক উসুল করে আমার প্যাকেট তাকে প্রদান করলাম। তারপর আঁকাবাঁকা পথ অবলম্বন করে হোটেলে চলে আসলাম। এর কারণ হলো, কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে তাকে ঘোল খাওয়ানো।

এবারও সমস্ত চিঠি সাদা কাগজে ছিলো। আমি যখন সেই সাদা কাগজ তাপ দিলাম তখন পরিচ্ছন্ন অক্ষর বেরিয়ে আসল। চিঠিতে জানানো হলো যে,

ফাইল দুটো তাদের কাছে পৌঁছেছে। তারা আমার এ সফলতার ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং উৎসাহব্যঞ্জক শব্দমালায় সাবাসী জানিয়েছে। আমার সাথীদের প্রত্যেকের জন্যও পৃথক পৃথক প্রশংসা ও সাবাসীমূলক পত্র পাঠানো হয়েছে। আমাদের সকলের পরিবারের সুস্থতা ও কুশলতার শুভ সংবাদও পত্রে লেখা রয়েছে। আমার পত্রে লেখা আছে যে, আমার কাজের বিনিময়ে বিশ হাজার টাকা আমার পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তখন পাকিস্তানে চা, চিনি, নাশপাতি ও ঘি-এর খুব অভাব ছিলো যার দরুন এ সকল বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের পাঁচজনের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম মিশন চালু রেখেই আমাকে নতুন এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের এজেন্সির অন্য একটি গ্রুপ পূর্ব থেকেই এই মিশনের কাজ করছিলো। আহমেদ নগরে আমার সফলতার জন্য আমাকেও এই মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মিশনটি ছিলো তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ইউরেনিয়াম কোথায় পাঠানো হচ্ছে এবং এই ইউরেনিয়ামকে কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে- এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করা। এবারের চিঠিতে আমাদের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে। দশ হাজার আমার জন্য আর পাঁচ হাজার করে বাকি সাথীদের জন্য। আমার চিঠি পড়া শেষ হলে আমি সেটি জ্বালিয়ে ফেললাম এবং ফাইলের ফিল্মও নষ্ট করে ফেললাম। সাথীদের টাকা ও চিঠি যার যার কাছে পৌঁছে দিলাম। তাদের চিঠি পড়া শেষ হলে তাও সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে ফেললাম। আমরা কোন অবস্থাতেই বিপদ ডেকে আনার জন্য প্রস্তুত নই।

আমি অনুধাবন করতে পারছিলাম যে, প্রথম মিশনের সফলতার কারণে আমার সিনিয়র আমার উপরে অনেক আশা ভরসার বাসা বেঁধেছেন যার জন্য আমাকে পুরো মিশনের দায়িত্ব দিয়েছেন। তরবিলাতে চাকরিকালীন সময়ে বিদেশী শ্রমিকদের থেকে আমি এতটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ ছাড়াও আরও কিছু প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু নিউক্লিয়ার এনার্জি সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল শূন্যের কোঠায়। যার দরুন আমি দিল্লীর বিভিন্ন বুকস্টল থেকে এ জাতীয় বই সংগ্রহে মনোযোগ দিলাম। অবসর সময়ে সে সমস্ত বই পড়তাম যাতে যে মিশনে আমি নামতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ না থাকি। আমার সাথীরা এবারের চিঠিতে সাবাসীবাণী পেয়ে সতেজ হয়ে উঠে। মানুষের স্বভাব এমনই। ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একবার হাত বুলিয়ে দিলে যে কাজ হয়, তা লাখ টাকার বিনিময়েও হয় না। তারা তাদের দায়িত্ব দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথেই

পালন করতে থাকে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য ও ছবি এনে দিল।

আর্মি হেড কোয়ার্টারে চাকরি করে এমন এক সুপারেন্টেন্ডের নাম হল যশোবন্ত। তার বাসা পুরাতন দিল্লীর এক ছোট গলিতে ছিলো। যশোবন্তের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় মেয়ে স্কুল শিক্ষিকা ও বাকি ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজে পড়ে। তার স্ত্রী পরলোকগতা। সে সপ্তাহে দু'একবার গান শুনতে বিশেষ বাজারে যায়। এ জাতীয় নানাবিধ তথ্য ছাড়াও তাদের ছবিও উঠানো হয়েছে। যশোবন্তের বাড়ির সাথেই এক করণিক যুবক থাকত। তার সাথে যশোবন্তের বড় মেয়ের এ্যাফেয়ার চলছিলো। তার নাম ও ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। হেড কোয়ার্টার পরিষ্কারকারী দু'জন খ্রিষ্টানের ছবি ও বাসার ঠিকানাও সংগ্রহ করা হয়েছে। আমার সাথীদের এই নিপুণ কর্মদক্ষতায় হেড কোয়ার্টারে পৌছানোর নতুন পথ আমি খুঁজে পেলাম। ইতিপূর্বে আমি আমার কাজের ধারা সম্পর্কে আমার সাথীদের কিছুই জানাতাম না। যার দরুন এমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে, তারা আমার সাথে মন খুলে কথা বলার সাহসও পেত না। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ভবিষ্যতে যা কিছু করব তার প্ল্যানিংয়ে তাদের পরিপূর্ণভাবে শামিল করব। তাদের ট্রেনিংয়ের সময় বলা হয়েছিল যে, তারা আমার প্রতিটি আদেশ বিনা প্রতিবাদে সম্পাদন করবে। কিন্তু তারা যদি এই শত্রুদেশে আমার কথা নাই মানত তবে আমি তাদেরকে কিই-বা করতে পারতাম। আমি আজ পর্যন্ত তাদের বাসায় যাইনি। এর একমাত্র কারণ ছিলো সিকিউরিটি। আমি তাদেরকে বললাম যে, আগামীকাল তাদের বাসায় যাবো এবং সকলে মিলে এই মিশনের পরিকল্পনা করব। তাদের এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ কোন মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তারা হয়তো ধারণা করতে পারে যে, তাদের সার্বিক সহায়তায় মিশন সম্পন্ন করে সমস্ত ক্রেডিট আমি নিজের নামে নিতে চাইলাম। যদি তাদের এমন কোন ধারণা থাকে তবে আমাকে সেটিও দূর করতে হবে। অথচ এ ধরনের সংশয়ের কোন বিষয় ছিলো না। আমি শুধু একটি বিষয়ে ভীত ছিলাম যে, তারা হলো জুনিয়র র‍্যাংকের যাদের কাজ শুধুমাত্র আদেশ পালন করা। তারা মাথা খাটিয়ে খুব কম কাজই করে থাকে। আল্লাহ্ না করুন কোথাও যদি কোন সমস্যা হয়ে যায় তবে তারা তা সামাল দিতে পারবে না। ফলে সমস্ত প্রোগ্রামই এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। অপরদিকে তাদের গ্রুপ লিডার হিসাবে সমস্ত মিশন ও তাদের যিম্মাদারী আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় হলো তাদেরকে এই মিশনে পরিপূর্ণভাবে যুক্ত

করা। পরদিন সন্ধ্যাবেলা কথামত তাদের বাসায় গেলাম। সেখানে এই মিশন নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, দুইজন মেথরকে আমার দুই সাথী পৃথক পৃথকভাবে সামলাবে আর বাকি সাথীরা জয়চান্দ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবে। জয়চান্দ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পর আমি নিজে তার দায়িত্ব নিব। এই সিদ্ধান্তের উপর সকলেই সম্মত হলো। তারপর যে দুই সাথী মেথর দুইজনকে সামলাবে তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে রাতের খাবার সেরে হোটেলে ফিরে আসলাম। পরবর্তী তিন সন্ধ্যা আমি হোটেল আকবর ও অশোকাতে কাটালাম।

চতুর্থ দিন সকাল দশটায় সার্ভিস ক্লাবে কর্ণেল শংকরের কামরায় চলে গেলাম। তার গেটকিপার কামরা পরিষ্কারে ব্যস্ত ছিলো। সাহেব অফিসে আছেন এই কথা বলেই সে আমাকে বিদায় দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি তার কাছে পানি চাইলাম এবং বললাম যে, খুব মাথা ধরেছে। যদি স্প্রীন ইত্যাদি ঔষধ থাকে তবে পানির সাথে তাকে দুটো দিতে বললাম। সে আমাকে সিটিং রুমে বসাল। সে স্প্রীন ও পানি নিয়ে এল। আমি তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে সে বলল যে, তার নাম আব্দুল করিম এবং আট মাস যাবৎ কর্ণেল শংকরের সাথে আছে। আমি তাকে বললাম যে, আব্দুল করিম! তোমার সম্পর্কে আমাকে আরও কিছু বলো। আমি মাথা ব্যথার বাহানায় চেয়ারে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। আর আব্দুল করিম বলতে শুরু করলো, স্যার! আমি চার বছর যাবৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আছি। আমি একজন সৈনিক কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন অফিসারের বেটম্যানই রয়ে গেছি। কর্ণেল শংকরের কাছে আসার পূর্বে আগ্রা ছাউনীতে এক মেজরের বেটম্যান ছিলাম। কর্ণেল সাহেব কড়া মেজাজের লোক। তিনি কারও উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না এবং কেউ তার বেটম্যান হিসেবে কাজ করতেও রাজি হয় না। কিন্তু যখন আমি এখানে এসেছি তখন থেকেই মনখুলে কর্ণেল সাহেবের সেবা করতে আছি। কিন্তু পুরস্কার হিসাবে প্রতিদিন পাই গালি। কর্ণেল সাহেব যখন কিছুটা ভাল মুডে থাকেন তখন কিছু টাকা পয়সাও পাই, কিন্তু যখন খারাপ মুডে থাকেন তখন অকথ্য গালি ছাড়া কিছুই পাই না। চার বছর পূর্বে ট্রেনিংকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন অফিসারের বেটম্যান থাকা অবস্থায় আমি যে পরিমাণ গালি খেয়েছি তাতে আমি গালি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টও হয়ে গেছি। সামরিক চাকরি ছাড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। দুনিয়াতে না বাবা মা আছে না বিবাহ করেছি। আব্দুল করিম পরিষ্কার উর্দু ভাষায় বলছিলো। আমি

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে কোথাকার অধিবাসী? জবাবে সে বলল- স্যার! লখনৌ হলো আমার জন্মভূমি। বাবার ঘরে সব সময়ই দারিদ্র্যতা বিরাজ করতো। তিনি বলতেন, তার পিতৃপুরুষ নাকি নবাব ছিলো। মরহুম পিতা বংশীয় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অল্প কিছু জমিজমা ও ঘরবাড়ি যা ছিলো তা বন্ধক রাখেন। পরবর্তীতে সেগুলো বিক্রি করে দেন। আমি যখন বুঝতে শিখলাম তখন থেকেই বাবার ঘরে দারিদ্র্যতা ও হাহাকার দেখতে পেলাম। আমার বয়স তখনো দশ পেরোয়নি এমন সময় কয়েক মাসের ব্যবধানে বাবা-মা দুজনই ইহলোক ত্যাগ করলেন। ফলে আমি একেবারে নিঃস্ব, অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়লাম। মরহুম পিতার পরিচিতজনের মধ্যে এক দোকানদার আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। তিনিই আমাকে এস.এস.সি. পর্যন্ত লেখাপড়া করান এবং সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেন। ভেবেছিলাম এখানে সসম্মানে রুজি উপার্জন করতে পারবো। এখানে রুজি পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু সর্বক্ষণ গালিতে মা, বাবা, বংশ, মাযহাব সব কিছুই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আব্দুল করিম বলেই চলছিলো আর আমার মাথায় অন্যকিছু খেলছিলো। তার কথায় আমি সূক্ষ্ম কিছু পয়েন্ট খুঁজে পেলাম যার চারপাশে আমার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আর তা হলো সৈনিক মুসলমান এবং হিন্দু অফিসারের উপর সে অসন্তুষ্ট, শুধু তাই নয় বরং বিদ্রোহী। তার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই এবং হেড কোয়ার্টারের উচ্চপদস্থ অফিসারের এক বেটম্যান। অবস্থা পূর্ব থেকেই তার ব্রেনওয়াশ করে রেখেছিলো। এখন বাকি কাজ আমি ইচ্ছা করলেই করতে পারি। কিন্তু সমস্যা হলো আমি হিন্দুর বেশে ছিলাম। আমার আসল পরিচয় প্রকাশ করার মধ্যে ফিফটি ফিফটি চান্স ছিলো যে, সে আমার সঙ্গ দিবে অথবা আমার পরিচয় তাদের জানিয়ে দিয়ে হিন্দু অফিসারদের কাছে নিজেকে একান্ত বিশ্বস্ত ও ভারতমাতার সুপুত্র হিসাবে প্রমাণ করবে। আমি সুযোগ হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না। যদিও এ কাজের জন্য সঠিক প্ল্যান প্রোগ্রাম ও অধিক যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন। আমি উঠতে উঠতে আব্দুল করিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কথায় আমি খুব ব্যথিত হয়েছি। অবশ্যই আমি তার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করব। এও বললাম যে, সে যেন আমার আসার খবর কর্ণেলকে না বলে। কিন্তু উল্টো সেই আমাকে বলল যে, স্যার! আমি আপনাকে যা বললাম এ ব্যাপারে কর্ণেলকে কিছু বলবেন না। আমার মুখতো কখনোই খুলবে না। আমি তার কাছ থেকে লখনৌর সেই দোকানদারের নাম ঠিকানা নিয়ে নিলাম। আমি চাচ্ছিলাম তার কথাগুলো

সত্য কিনা তা যাচাই করতে। তাকে পাঁচশত টাকা দিয়ে আমি সেখান থেকে বিদায় হলাম। আমার মগজ আব্দুল করিমকে দিয়ে বড় ধরনের কিছু করার জাল বুনতে থাকলো। কিন্তু আমাকে কোন মামুলী কদম উঠানোর পূর্বেও তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ যাচাই-বাছাই করতে হবে।

বিকাল বেলা সাথীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাদের বাসায় গেলাম। গেট বাড়ির মালিক খুলে দিল। আমি তাকে আমার নাম আযহার আলী বলে পরিচয় দিয়ে বললাম যে, আমার একজন পরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধু এখানে থাকে। সাথীদের মধ্য থেকে একজনের নাম বললাম। তারা এখানে তাদের আসল নামেই উঠেছিল যেন বিভিন্ন নামের চক্করে পড়ে ভুল নাম না বলে। বাসার মালিক আমাকে উপরে যাওয়ার পথ ছেড়ে দিলেন। সাথীদের নিয়ে আমি এক কামরায় মিটিং করলাম এবং বললাম যে, একজনকে অবস্থা জানার জন্য লখনৌ যেতে হবে। সকলেই যাবার জন্য প্রস্তুত হল কিন্তু আমি দু'জনকে নির্বাচন করলাম। তাদেরকে বলে দিলাম। লখনৌতে একে অপর থেকে কিছুটা দূরে থাকবে। তাদের কাজ হলো আব্দুল করিমের কথানুযায়ী যে দোকানদার তাকে লালন পালন করেছে তার ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য উদ্ধার করা এবং যদি তার কোন নিকট আত্মীয় থেকে থাকে তবে তার খোঁজ খবর নেওয়া এবং প্রাপ্ত সকল তথ্যের সত্যতা যাচাই করা।

পরদিন বিকাল বেলা আমি কর্ণেল শংকরের কাছে গেলাম। সে নিয়মানুযায়ী লনে আড্ডা সাজিয়ে বসেছিলো। আব্দুল করিম আদেশ পালনের জন্য প্রবেশ পথেই ভদ্রভাবে দাঁড়ানো ছিলো। সে চোখে চোখে এবং হালকা মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে সালাম দিল। কর্ণেলের মন-মেজাজ আজ ফুরফুরে মনে হচ্ছিলো। সে আমাকে দেখামাত্র বলে উঠল, হ্যালো মিস্টার পামিস্ট! প্লিজ কাম এন্ড জয়েন মি। আসুন আসুন, আমাকে সঙ্গ দিন। আমি তার সাথে কথা শুরু করলাম। কর্ণেল সাহেব হয়তো আমার নাম ভুলে গিয়েছিলো যার ফলে বারবার আমাকে মিস্টার পামিস্ট বলে সম্বোধন করছিলো। আমি হেসে হেসেই বললাম, কর্ণেল সাহেব! আমি পামিস্ট নই, একজন চা ব্যবসায়ী। আর আমার নাম উনুদ চোপড়া। কর্ণেল পরিষ্কার ভাষায় বলে দিল, তোমার নাম মনে আসছিলো না কিন্তু পামিস্ট তোমাকে এজন্যই বলেছি যে, তুমি প্রথম সাক্ষাতেই আমার অতীত জীবনের কাহিনী ঠিকঠিক করে বলে দিয়েছ। আমি তাকে বললাম, আমি পামিস্টারীর (হস্তরেখাবিদ্যার) বর্ণমালা সম্পর্কেও অবগত নই। তবে ফেস রিডিং-এর ব্যাপারে যৎসামান্য ধারণা আছে যা আমার ব্যবসায় বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্কের সুবাদে তাদের চেহারা দেখে,

চেহারার প্রতিক্রিয়া দেখে হয়েছে। কর্ণেল বলে উঠল, কিন্তু আমার ব্যাপারে তুমি কিভাবে অনুমান করলে? জবাবে আমি বললাম যে, সার্ভিস ক্লাবে আপনার অবস্থান থেকে অনুমান করেছি যে আপনার ফ্যামিলি নেই। থাকলে আপনি সরকারী হেডকোয়ার্টারে থাকতেন। ক্লাবের আনন্দফুর্তি ছেড়ে একাকী আড্ডা জমান। আপনার কথানুযায়ী আপনার বন্ধু-বান্ধব খুবই কম। আপনি আপনার বিকাল মদ্যপান করে কাটান এবং একাকী জীবন-যাপন পছন্দ করেন। এর থেকে আমি রেজাল্ট বের করেছি যে, অতীতে এমন কিছু স্মৃতি আছে যা আপনাকে সবসময় পীড়া দেয় আর আপনি শত চেষ্টা করেও সে স্মৃতি ভুলতে পারেন না। এ ধরনের স্মৃতি একমাত্র যৌবনকালে ভালবাসার ব্যর্থতা থেকেই হতে পারে। কর্ণেল মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনতে থাকে। কথার ধারা চালু রাখতে গিয়ে বললাম যে, যেহেতু আমি নিজেও আমার অতীতে এমন ব্যর্থতার শিকার হয়েছি তাই আপনার মানসিক ব্যথাকে খুব ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছি। আপনাকে দেখে আমার একটি কবিতা মনে পড়ে গেল–

"এমনি কিছু সাজিয়ে ছিলাম বিরান ভূমি
শহরবাসীও যেখানে ভুলে যায় তার স্মৃতি"।

আমার তো ইচ্ছে হয় প্রত্যহ বিকাল বেলাটা আপনার সাথে কাটাই কিন্তু প্রতিদিন এজন্য আসা হয় না যে, এমন স্মৃতিতে বিভোর ব্যক্তি নিজের একাকীত্বে কারও অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন না। এ ব্যাপারে আমি তাকে আরও কি কি বলেছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু আমি যখন চুপ হলাম তখন এমন কঠিন কর্ণেলও মোমের মত গলে গেল। লেনে প্রজ্জ্বলিত নীলাভ লাইটে তার আঁখি অশ্রুপূর্ণ দেখা যাচ্ছিল। কর্ণেল কিছুক্ষণ চেয়ারে মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে বসে থাকল। যখন সম্বিত ফিরে আসল তখন বলতে শুরু করল যে, আমি আজ পর্যন্ত আমার অতীত সম্পর্কে মাত্র দুই তিনজন বন্ধুকে বলেছি। আর আজ তোমাকে বলছি এজন্য যে, তুমি বলা ব্যতীতই আমার অতীত সম্পর্কে জেনে গেছো। সে বলতে লাগল, আমি লাহোরের অধিবাসী এবং রাবীন। আমি এই পয়েন্ট নোট করে অপরিচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম রাবীন দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন? (অথচ আমি নিজেও একজন রাবীন। লাহোর সরকারী কলেজের ছাত্রদের রাবীন বলা হয়ে থাকে। এই কলেজ ভারত বিভক্তির পূর্বে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে নামকরা কলেজ ছিলো।) কর্ণেল বলল, কলেজে শিলাভুনুট নামে এক খ্রিষ্টান মেয়ের সাথে তার ভালবাসা হয়েছিল। এই ভালবাসা এক তরফা ছিলো না বরং উভয় দিক থেকে এই

আগুন সমান তালে জ্বলতেছিলো। সে কলেজের নামকরা ছাত্রদের একজন ছিলো এবং পিরাকীতে কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন ছিলো। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, গ্র্যাজুয়েশনের পর আই.সি.এস. (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস) ইন্টারভিউ দিবে। শিলারও একই ইচ্ছা ছিল। উভয়ে একসাথে বি.এ. পরীক্ষা দেয়। তাদের দু'জনার বাসাই ছিলো কোপড় রোডে। তার বাবা পাঞ্জাবের সরকারী চাকুরে ছিল। তারপর কর্ণেল সাহেব কিছুটা স্বস্তির সাথে বলতে থাকে- আমাদের উভয়ের পরিবার এই ভালবাসা সম্পর্কে অবগত ছিলো এবং আমরা একে অপরের বাসায় খুব বেশি যাতায়াত করতাম।

'৪৭ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। একদিন বিকাল বেলা আমাদের বাসার সামনের এক বাসায় দাঙ্গাবাজরা আগুন ধরিয়ে দেয়। আর সেই বাসা ছিলো এক মুসলমানের। আমার পিতা ছিলেন হার্টের রোগী। তিনি এই দৃশ্য দেখে হার্ট এটাকে ইন্তেকাল করেন। তারপর কর্ণেল সাহেব অত্যন্ত হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠেন, দাঙ্গাবাজদের দাঙ্গা তো কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু পিতার মৃত্যু আমার সব শেষ করে দিয়ে গেল। আমার বাবা কোন ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যাননি। ফলে পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব বর্তাল আমার উপর। আমি রংমহলের এক দোকানে পার্টটাইমের চাকরি নিলাম। আশা করেছিলাম, বাবার পেনশনের টাকা পেয়ে গেলে তখন আমি আই.সি.এস.-এর প্রস্তুতি গ্রহণ করব কিন্তু তাও সম্ভব হয় না। ধীরে ধীরে শিলার পরিবারে আমাদের আর্থিক দূরাবস্থার কথা প্রকাশ পেয়ে গেল। ফলে তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। শিলাও আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তার সাথে ইন্ডিয়ান এক খ্রিষ্টান ক্যাপ্টেনের বিয়ের কথা ঠিক হলো। আমি তাকে শত সহস্রবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু তা বিফল হয়েছে। তাকে আমাদের অতীত দিনের স্মৃতি ও শপথের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কোনই কাজ হলো না। দেখতে দেখতে একদিন সত্যি সত্যিই সে সেই খ্রিষ্টান ক্যাপ্টেনের সহধর্মিনী হয়ে গেল। এত কিছুর পরও আমি শিলাকে মন থেকে মুছতে পারিনি। নিজের সকল ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখি যে, আমার হৃদয়ের রানী অন্য এক পুরুষের ঘরনী হয়ে গীর্জা হতে বের হয়ে আসছে। কিন্তু আফসোস! কোন কিছু করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি বোবা বনে গেলাম। এরই মাঝে ভারত বিভক্তি সম্পন্ন হলো। আমি আমার মা ও দুইবোনকে নিয়ে ভারত চলে আসলাম। আমাদের লাহোরের বাসা বাবার এক বন্ধু ন্যায্য মূল্যে খরিদ করে নেন। সেই টাকা দিয়ে বোনের

বিবাহ সম্পন্ন করলাম। কিছুদিন পর আমার মাও ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। তারপর একদিন সেনা বাহিনীতে ভর্তি হলাম। দুই বছর ছয় মাস ট্রেনিংয়ের পর সেকেন্ড লেফটেনেন্ট-এ উন্নীত হলাম। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি শিলাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু তার ভালবাসার স্মৃতি হৃদয়ের গভীরে এমনভাবে গেঁথেছে যে আমি প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। কর্ণেলের ব্যথিত হৃদয়ে আজ দুঃখের জোয়ার এমনভাবে উথলে উঠেছে যে, তার আবেগের সকল বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ফলে সে বলতেই থাকে। সে বলল যে, '৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আমি পদাতিক বাহিনীর এক কোম্পানীর কমান্ডার ছিলাম এবং লাহোর ক্যাম্পে আমার কোম্পানীর ডিউটি ছিলো। আমার সহকর্মীরা বলল যে, পাকিস্তানের এক বড় তোপ সম্ভবত রানী বা শিরনী-এর লোকেশন তারা দেখেছে। যদি আমি আগ্রহী হতাম তবে আমার আর্টিলারীদের বলে এই তোপ ধ্বংস করতে পারতাম কিন্তু আমি তা করিনি। যদিও আমার আর্টিলারীর সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তথাপি আমি তাদের কাছে সংবাদ পাঠানোর জন্য ভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে পারতাম। আমার এই দুর্বলতা সম্ভবত লাহোরে থাকা অবস্থায় শিলার সাথে ভালবাসা এবং লাহোরের মোহাব্বতেই হয়েছে। যার কারণে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। আমার এই অবহেলার শাস্তিস্বরূপ আমাকে অফিসিয়াল কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। যার ফলে আজও আমি বিবাহ করিনি এবং অফিস টাইমের পর বাকি সময় একাকী এখানে মদপানে কাটাই।

কর্ণেল শংকর আরও অনেক কথা বললেন। এর দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর অসন্তুষ্ট এবং মানসিক দিক দিয়ে অন্য সৈনিকদের মত ততটা কঠোর পাকিস্তানবিদ্বেষী নন। রাত বারোটার দিকে আমাদের আড্ডা শেষ হল। আমি কর্ণেল শংকরের প্রতি দ্বিমুখী কল্পনাতে আচ্ছন্ন হয়ে হোটেলে ফিরে আসলাম। এখন আমি পাকিস্তানের রানী ও শিরনী তোপ সম্পর্কে পাঠকদের কিছুটা অবহিত করতে চাই। এই দুই সুপারহিওয়াই হুটিয়ার (এক প্রকার তোপ) আমেরিকা উপযুক্ত সময়ে পাকিস্তানকে দিয়েছিলো। এর মধ্যে ব্যবহৃত গোলার ওজন ২৫০ পাউন্ড। এর রেঞ্জ ২২ মাইল পর্যন্ত। একশত মিটারের মধ্যে যা আছে সব ধ্বংস করে দেয় এই গোলা। এই তোপ চালানোর সময় এত বিকট শব্দ হয় যে, গোলন্দাজদের কানের পর্দা ফেটে যায়। এজন্য গোলা নিক্ষেপের সময় নিক্ষেপকারী গোলন্দাজদের কানে সাউন্ডপ্রুফ পট্টি লাগানো হয়। তা সত্ত্বেও আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য কাছাকাছি পানির ট্যাংক রাখা হয় যাতে লাফিয়ে

পড়ে বিকট আওয়াজ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। '৬৫ এবং '৭১-এর যুদ্ধে এই তোপ দুটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় সৈন্যরা এই গোলার আওয়াজ শোনামাত্রই ভয়ে কাঁপত এবং উল্টো পথে মোর্চায় ফিরে আসত। কর্ণেল শংকর শরাবের নেশায় তার দিল খুলে আমার সামনে রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি ভাবছিলাম আমাকে পরীক্ষা করার জন্য কর্ণেলের এটা কোন চাল কিনা। আব্দুল করিমের ব্যথাভরা কাহিনী এবং কর্ণেল শংকরের প্রেমের উপাখ্যান সত্য অথবা মিথ্যা যে কোনটাই হতে পারে। এ অবস্থায় আমার প্রতিটি কদম হিসাব করে ও খুব সাবধানে ফেলতে হবে। আমি তাদের প্রতিটি শব্দের ও বাক্যের বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার সাথীরা লখনৌ থেকে ফিরে এসে আব্দুল করিমের কথা সত্যায়িত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সামনে কদম বাড়াবো না। তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে আমাদেরকে পাকিস্তানে কোন ব্রিফিং করা হয়নি। এই মিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যার জন্য আমি সম্ভাবনাময় সকল তথ্য একত্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নিউক্লিয়ার এনার্জি সম্পর্কিত বই আমি পূর্বেই সংগ্রহ করেছি। এখন আমি চাচ্ছিলাম সেখানকার সিকিউরিটির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হতে।

# যশোবন্তের গ্রেফতারী

আমার সাথীদের মানসিক অবস্থা খুবই দুর্বল। শত্রুদেশে হিন্দু হয়ে থাকা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্পর্শকাতর ও Classified তথ্য উদ্ধার করা এবং প্রতিনিয়ত গ্রেফতারীর ভয় আমাদেরকে মানসিকভাবে কাবু করে রেখেছে। আমাদের চেহারা থেকে মুচকি হাসিটি হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের হাসি হচ্ছে কৃত্রিম হাসি। রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে আমরা অনেকেই হকচকিয়ে যাই। আমার অবস্থাতো আমি জানতাম, আর আমার সাথীরাও তাদের মানসিক অবস্থা আমাকে জানিয়েছে। পাকিস্তানে ট্রেনিংকালে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘব করার জন্যে একটি আরামদায়ক ঔষধ সেবন করতে বলা হয়েছে। আমরা এই ঔষধ সেবন করতে শুরু করলাম এক সপ্তাহ সেবন করার পর আমাদের মানসিক দুশ্চিন্তা বাস্তবেই কমে গেল।

লাখনৌগামী আমার সাথীদ্বয় চতুর্থ দিন ফিরে এলো। তারা আব্দুল করিম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এসেছে। দোকানদার আব্দুল করিমের বলা সকল কথার সত্যায়ন করেছে এবং তার সম্পর্কে এও বলেছে যে, তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়াও একজন আপন চাচা আছে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর পাষাণ আব্দুল করিমের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এই এতীমকে দয়ামায়া করার পরিবর্তে তার ঘরের অবশিষ্ট আসবাবপত্র জোর করে নিয়ে গেছে। আব্দুল করিম নিঃস্ব অসহায় নিরাশ্রয়ে পড়ে রয়েছে। তার পিতার সাথে বন্ধুত্বের সুবাদে এই দোকানদার তাকে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছে এবং লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ব্যবসাও শিক্ষা দিয়েছেন। মেট্রিক পাস করার পর আব্দুল করিমের আরো লেখাপড়া করা। ইচ্ছা ছিল। তাই সে অনেকদিন কাজ করল। যখনই সে সুযোগের নাগাল পেল তখনি সে সেনা বাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেল। দোকানদার আমার সাথীদের কাছে এই জিজ্ঞাসাবাদের কারণ জানতে চাইল। জবাবে তারা বলল যে, আব্দুল করিমের সাথে তাদেরই বংশের এক মেয়ের বিয়ের আলোচনা হচ্ছে। আর সেই সুবাদেই এখানে আসা। তখন দোকানদার বলল যে, আব্দুল করিম একজন নম্র-ভদ্র ও নবাব বংশের কৃতি সন্তান। যদি তার কোন মেয়ে থাকত তবে তাকে আব্দুল করিমের কাছে বিবাহ দিয়ে গর্বিত হতেন। মোটকথা, আব্দুল করিমের বর্ণনাকৃত সকল কথা সত্যায়িত হয়েছে। এখন আমাকে তার সহযোগিতার প্রোগ্রাম সাজানো বাকী।

এখন পর্যন্ত আমার সামনে আব্দুল করিমের যে চিত্র তা এক সম্ভ্রান্ত অসহায় মুসলমান ও ভারতীয় সৈন্য বৈ অন্য কিছু নয়। যে কিনা প্রতিনিয়তই স্বীয় উর্ধতন অফিসার কর্তৃক অশ্রাব্য গাল মন্দ ও নির্মম দুর্ব্যবহারের শিকার। এটা সেই চিত্রের ইতিবাচক দিক আর নেতিবাচক দিক হল যে, সে নিজের দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও নিজের দেশের কল্যাণকামী হতে পারে। তার দলিত মথিত মান-সম্মান তাকে বিদ্রোহী বানিয়ে দিতে পারে। যার ফলে নিজের হারানো মান-সম্মান ফিরে পাবার লক্ষ্যে আমাদের গোপন রহস্য তার অফিসারদের কাছে বলে ভারত মাতার সুপুত্র হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তার নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিকই তার জন্যে সম্ভব।

পাকিস্তানের প্রতি লক্ষ্য করা যাক, দেখা যাবে যে আমরা সকলেই পাকিস্তানী। তাও আবার কিছু সংখ্যক ছাড়া বাকী সকলেই মুসলমান। কিন্তু আমাদের মধ্যে মাতৃভূমির মান-সম্মানকে পিছু ঠেলে নিজের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারী গাদ্দার দেশ বিক্রেতার সংখ্যাও লাখ লাখ পাওয়া যাবে। অন্যথায় ভারতীয় ট্যাংকে বসে পাকিস্তানে আসার দাবিকারী, পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা যা আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক, তাকে কায়েদের মাজারে অগ্নিদাহকারী, পাকিস্তানকে টুকরা টুকরা করার প্রকাশ্য ঘোষণাকারী অদ্যতক জীবিত থাকত না। আমি মনে করি, এই গাদ্দারদের কথা শুনে নীরবতা পালনকারীও মাতৃভূমির ভালবাসা থেকে ততদূরে যতখানি দূর সে গাদ্দার। আমার বুঝে আসে না যে, মা-বোনের গালি শুনে ক্রোধান্বিত হওয়া ও মারামারির কথায় মরিয়া হয়ে উঠা ব্যক্তিদের আত্মমর্যাদা তখন কেন লোপ পেয়ে যায়, যখন কেউ তার মাতৃভূমিকে গালি দেয়। হয়তো তারা ঐ প্রকৃতির লোক যারা স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ এবং তারা স্বাধীন জন্মভূমিতে কালের বাঁকে বাঁকে সম্মুখীন সকল সমস্যার সমাধান শত্রুর গোলামীতে খুঁজে ফিরে। এ সকল রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকুক বা রিরোধী দলে থাকুক শুধু ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত থাকে। যে কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য একমাত্র পাকিস্তানকে লুটপাট করা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, পাকিস্তানের ভৌগলিক ও কূটনৈতিক সীমান্তের রক্ষক। তারা কখনোই কল্পনা করে না যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জওয়ান ও অফিসারগণ তাদের চেয়ে আটগুণ বড় শত্রুর সামনে বুকটান করে জীবন হাতে নিয়ে এক শীশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। যে শত্রুর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং এখনো তা অটুট রাখার লোভে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। পাকিস্তানে সন্ত্রাসী যদি পাকিস্তানী হয়ে থাকে, তবে একথা

ঠিক যে সে শত্রুর এজেন্ট। বিভীষিকাময় মৃত্যুই তাদের কপালে রয়েছে। ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত আমরা এই মহামারি থেকে মুক্তি লাভ করব।

এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি সাথীদের সাথে পরামর্শ করাকে সমচীন মনে করলাম এবং তাদের সাথে আলোচনা করে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয় জানতে চেষ্টা করলাম। সাথীদের মত হচ্ছে যে, রাতের বেলা আব্দুল করিমকে অপহরণ করে নিয়ে আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্যে তাকে বুঝাবো বা তাকে শেষ করে দিবো এবং তার কামরা হতে ব্রিফকেস ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হস্ত গত করবো। এই উভয় মতই হালকা আলোচনার পর বাতিল করে দেয়া হল। অপহরণ করার পর সে জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের সঙ্গ দেয়ার ওয়াদা করবে। পরে শুধু ষড়যন্ত্রই করবে না বরং আমাদের ধরিয়ে দিয়ে নিজে সুনাম কামাবে। কর্ণেলকে যদি শেষ করে দিই তাহলে একথার কি গ্যারান্টি আছে যে, তার কামরায় রক্ষিত কাগজপত্র একান্তই গুরুত্বপূর্ণ, তা নাও তো হতে পারে। উভয় অবস্থাতেই ভারতের সিকিউরিটি শুধু সতর্কই হবে না বরং আমার গ্রেফতার হওয়ার আশংকা বেড়ে যাবে। কেননা, কর্ণেল শংকরের সাথে সাক্ষাতকারীদের তালিকায় সর্বপ্রথম আমার নামই আসবে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হল যে, উভয়কেই যার যার অবস্থাতে স্ট্যান্ডবাই পজিশনে রেখে অধিক কালটিভেট করতে হবে এবং আপন মিশন অর্থাৎ আর্মি হেড কোয়ার্টারে পৌঁছাতে হবে ও তথ্য উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এখন আমাদের পূর্ণ মনোযোগ হেড কোয়ার্টারের সুপারেন্টেন্ড যশোবন্তের প্রতি এবং সেই খ্রিষ্টান দুই সুইপারের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে। পরদিনই এক সাথীকে নিয়ে অফিস ছুটির সময় আর্মি হেড কোয়ার্টারের নিকটবর্তী বাস স্টেশনে চলে গেলাম এবং আমরা যশোবন্তের সাথে একই বাসে আরোহণ করলাম এবং তার পিছু নিলাম। এভাবেই তার বাসা চিনে ফেললাম। আর দুই সাথীকে সুইপারের পিছনে লাগিয়ে দিলাম তাদের সাথে সম্পর্ক করার জন্যে। এমনিভাবে অফিস টাইমের পর শুধু তার কর্মতৎপরতাই ফলো করবে না বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে তাতে অংশগ্রহণও করবে। অন্য সাথীদের ডিউটি দিলাম যে, অফিস টাইমের পর তারা যশোবন্তের সারভেলেন্স পর্যবেক্ষণ করতে এবং যেদিন বিকাল বেলা সে গান শুনতে যাবে তখন তাদের একজন তার পিছু নিবে সেই বালাখানা চিহ্নিত করার জন্য যেখানে সে থাকে এবং অপর সাথী আমাকে জানানোর জন্যে ঐ এলাকার চাউড়ী বাজারের আগে এক রেষ্টুরেন্টে আসবে। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭.০০ টায় আমি উপস্থিত থাকব।

মাসের প্রথম ভাগ এই রেষ্টুরেন্টে আমাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। সম্ভবত তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন ছিল। যেদিন সাথী রেষ্টুরেন্টে এসে আমাকে ইশারা দিল। অল্পক্ষণ পরেই আমরা সেই বালাখানার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম যেখানে যশোবন্ত গিয়েছে। আমি সাথীকে বিদায় করে দিলাম। কেননা আমার প্রোগ্রাম শুধুমাত্র যশোবন্তের সাথে পরিচিত হওয়া ও সম্পর্ক করা। আমি বালাখানার সিঁড়ি বেয়ে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত কামরায় পৌঁছলাম যেখানে গান বাজনা হয়। বৈঠকখানাটি বেশ বড়সড়ই যার চারিদিকে বিভিন্ন ঢংয়ের চেয়ার পাতা রয়েছে। এখনো অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। নায়িকা আমাকে ওয়েলকাম জানালো। আমি যশোবন্তের পাশের চেয়ারে বসলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি সাদা পেয়ালাতে রোপার পাতায় মোড়ানো পান আমাকে পেশ করা হল। আমি পান উঠিয়ে বিশ টাকার একটি নোট পেয়ালাতে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর সঙ্গীত শিল্পীরা চলে এলো এবং নিজেদের ড্রেস ঠিক করতে লাগল। এখনো গানের প্রস্তুতিই চলছে। এহেন মুহূর্তে যশোবন্ত ছাড়াও অন্য দুই তিনজনের সামনে নায়িকা পিছনের কামরা থেকে গ্লাস ও পানীয় বোতল দিতে বলল। খুবই ভদ্রভাবে নায়িকা আমার কাছে জানতে চাইল, আপনি আনন্দ করবেন? আপনার সামনে পেশ করার মত সবকিছু আমাদের কাছেই আছে। জবাবে আমি বললাম যে, আমি আজ মোডে নেই তাই ঠাণ্ডা পানীয় পান করব। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডা কোকাকোলার দুটি বোতল আমার সামনে রাখা হল।

অনুষ্ঠানের সূচনা মধ্যশ্রেণীর সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হল। এই সময় যশোবন্ত তার মদের বোতলের অর্ধেক পান করে শেষ করেছে। আমি যশোবন্তের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখলাম যে তার সু-দৃষ্টি কোন নর্তকীর প্রতি নিবদ্ধ তা জানার জন্যে। সঙ্গীতে বাজনার পালা শেষ হল। এরপর তিন তরুণ নৃত্যশিল্পী তাদের পায়ে নূপুর বাঁধতে থাকল। যশোবন্ত বোতলের অবশিষ্ট মদ গ্লাসে ঢালল এবং সামান্য কিছু পানি মিশিয়ে একটানে পান করে ফেলল। এই তিন নৃত্যশিল্পী দর্শকদের মাঝে এসে সকলকে কুর্নিশ করল। এখনো তারা তবলার তালে তালে অন্য নৃত্যশিল্পীদের সাথে পা মিলিয়ে যাচ্ছিল। তখন যশোবন্ত পকেট থেকে আরেকটি বোতল বের করল। এটা হচ্ছে ভারতের তৈরি রাম। আর রাম যেহেতু পুরো বোতল গোল ও অর্ধ চেপটা তাই সহজেই পকেটে পুরা যায়। যশোবন্ত দ্বিতীয় বোতল থেকেও কিছু রাম বের করে গ্লাসে ঢেলে পান করে ফেলল। এখন সে পরিপূর্ণভাবে নেশাগ্রস্ত।

গান শুরু হল এক টাকার বিল রেট দিয়ে। নৃত্যশিল্পীদ্বয় তাদের নৃত্য শুরু করল এই তিনজনের পা এবং তাদের নৃত্যের তালে এমন মিল হচ্ছে যে মনে হচ্ছে একই শরীরের তিন অংশ। তাদের নৃত্য অনুষ্ঠান গরম করে দিল এবং দর্শকদের মাতিয়ে তুলল। তাই বিল এখন এক টাকা থেকে বেড়ে পাঁচ টাকা হয়ে গেল। যেহেতু সেখানে যশোবন্তকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং নর্তকীদেরকে আমার টাকায় প্রভাবিত করা আমার উদ্দেশ্য সেহেতু আমি দশ টাকা দিতে শুরু করলাম। বালাখানার প্রথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি বেশি বিল দিবে তারই সামনে গিয়ে নাচতে নাচতে বসে বিল নিতে হবে। দশ টাকার বিলে অন্য দর্শকরা চমকে গেল এবং দশ টাকা নোটের প্যাকেট বানিয়ে বিল দিতে শুরু করল। তবে বিল দেয়ার মধ্যে বিরতি দীর্ঘায়িত করল। আমি বিশ টাকা করে দিতে লাগলাম। বালাখানার নিয়ম-নীতি হল যদি একই সময় দুই বা ততোধিক দর্শক বিল পেশ করে তবে বেশি বিলদাতার সামনে নর্তকী প্রথম আসবে। আমি নিজের সাথে বেশ টাকা নিয়ে এসেছি। বিশ টাকা নোটের এক তোড়া ছাড়াও একশত টাকার ষাটটি নোট আমার কাছে রয়েছে। একই সময় আমি এবং যশোবন্ত বিশেষ নর্তকীকে বিল দেওয়ার ইশারা করলাম। আমার কাছে রয়েছে বিশ টাকার নোট আর যশোবন্ত দশ টাকার নোট বাড়িয়ে রেখেছে। নর্তকী আমার কাছে এল এবং নোট নিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় আরেকটি নোট দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলাম।

আমি বিশ টাকার নোটের বান্ডিল আমার সামনে গালিচার উপরে রাখলাম এবং একের পর এক নোট দিয়ে সেই নর্তকীকে আটক করে রাখলাম। যশোবন্ত হাত গুটিয়ে পিছে নিয়ে এল। আমি আমার ক্রমধারা চালু রাখলাম। যশোবন্ত নিরাশ হয়ে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় আমি তার বাহু ধরে বসিয়ে দিয়ে বললাম, যশোবন্ত বাবু! কি ব্যাপার, আপনি উঠে যাচ্ছেন! সে একজন অপরিচিতের মুখে নিজের নাম শুনে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমি স্বাভাবিকভাবে একটা হাত তার কটিদেশে বাড়িয়ে দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলাম। অপর হাতে বিল প্রথমে যশোবন্তের মাথায় রেখে পর্যায়ক্রমে তার মাথা ও গণ্ডদেশে রেখে দিতে থাকলাম। নর্তকীর কাজ তো টাকা সংগ্রহ করা। যার দরুন সে আমার প্রদানকৃত বিল যশোবন্তের মাথা এবং গণ্ডদেশ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। শরাবের নেশায় মাতাল যশোবন্ত দুই একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু নর্তকীর চোখ ধাঁধানো লোভনীয় রূপ-লাবণ্যতা তাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে শেষ পর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিল। অন্য

নর্তকীরা নাচতেছে আর দর্শকদের টাকাগুলো লুফে নিচ্ছে। কয়েকজন দর্শক মুকাবিলা করার শক্তি হারিয়ে নিজের উপর অভিমান করে চলে গেল। এ সময়ে নতুন দুটি সুর লহরী শুরু হল। আমি যশোবন্তের প্রিয়া নর্তকীকে তার সামনে থেকে উঠতে দিলাম না। আমার বান্ডিলে আর মাত্র চার পাঁচটি নোট বাকি এ সময় আমি একশত টাকার বিশটি নোট নায়িকার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। নোট কয়টি শেষ হওয়ার পূর্বেই বিশ টাকা নোটের নতুন এক বান্ডিল আমার সামনে রেখে দিলাম। নায়িকা আমার কাছ থেকে সবগুলো টাকা নেওয়ার ইচ্ছায় নাচ বন্ধ করে দিল। ফলে একটু বিরতি ঘটল। এই বিরতিতে নায়িকারা খাবারের কথা জিজ্ঞেস করল। আমি শিক কাবাব ও পরোটা চাইলাম। এক হাজার টাকা নায়িকার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম যে, আমি যশোবন্ত ও তার প্রিয়া কামরার পিছনে বসে একত্রে খাব। নায়িকা মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল।

আমরা তিনজন পিছনের কামরায় একত্রে খানা খেলাম। খাবারের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু মদ বেশি পান করার ফলে যশোবন্ত ভারসাম্য হারিয়ে এদিক সেদিক দুলছে। আমি নর্তকীকে বললাম, তার মেজাজ ঠিক নেই। আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি। এই বলে নর্তকীকে আরও পাঁচশত টাকা দিয়ে যশোবন্তকে সামলে নিয়ে চলে এলাম। আমার সাথী রেষ্টুরেন্টে অপেক্ষায় ছিল। আমি তাকে একটি টেক্সি আনতে বললাম। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তড়িঘড়ি করে একটি টেক্সি নিয়ে এল। চাউড়ী বাজারের পিছনেই ছোট দুই গলিতে দেহব্যবসা চলত। আমি সেখানেই টেক্সি থামালাম। যশোবন্ত তো টেক্সিতেই নাক ডাকতেছে। আমি সেই গলিতে গেলাম। গলির প্রবেশ পথে পুলিশের হেড কনষ্টেবল এবং সিপাহী পূর্ব থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের সন্ধানী দৃষ্টি পরিমাপ করে পঞ্চাশ টাকা কনষ্টেবলের মুঠে পুরে দিলাম। সে হেসে আমাকে সামনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করল। আমি গলির এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চক্কর লাগালাম। এরপর তন্বি তরুণী এক সুন্দরীর কাছে গেলাম। সে বলল, একবারে ত্রিশ টাকা দিতে হবে। জবাবে আমি বললাম, তিনশত টাকা দিব এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরৎ দিয়ে যাব। সে ভাবতে থাকল, আমি বললাম পাঁচশত টাকা দিব। এতে সে দেলোয়ার নামক এক ব্যক্তিকে ডেকে আমার কথা বলল। দেলোয়ার এসে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় নিয়ে যাবেন? আমি বললাম, দরিয়াগঞ্জ। সে বলল, কোন মতলব আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ! একজন

হিন্দুকে অপদস্ত করতে হবে। কয়েকজন মুসলিম নারীকে সে নষ্ট করেছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মুসলমান? জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ। জবাব শুনে বলল, আপনি এদিক সেদিক না ঘুরিয়ে সরাসরি সত্য কথাটিই বলেছেন। আপনাকে দেখতেও একজন ভদ্র মানুষ মনে হচ্ছে। আমি জরিকে আপনার সাথে পাঠাচ্ছি। আপনি তাকে এক ঘণ্টা নয় সকাল পর্যন্ত রাখতে পারেন। কিন্তু তাকে নিরাপদে আবার ফেরৎ দিয়ে যাবেন। আমি তাকে বললাম, তার কাছে কোন পুরুষই যাবে না। আমরা শুধু হিন্দুকে অপদস্ত করব এতটুকুই। সে জরিকে আমাদের সাথে যেতে বলে নিজে কামরার ভিতরে চলে গেল।

জরি পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ম্যাকআপ ঠিক করে বাইরে চলে এল। আমি তাকে নিয়ে গলির বাইরে চলে এলাম। আমি সামনের সিটে বসলাম, পিছনের সিটের এক পাশে যশোবন্ত মাঝে জরি ও অপর পাশে আমার সাথী বসল। ড্রাইভারকে দরিয়াগঞ্জ যেতে বললাম। পথে আধা মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই। শুধুই বন-জঙ্গল। আমি ড্রাইভারকে এখানেই গাড়ি থামাতে বললাম। আমি আমার সাথীকে বললাম যে, যশোবন্তকে সাহায্য করে বনের পিছনে নিয়ে যাও। আর জরিকে তার পিছনে যাওয়ার জন্য বললাম। আমি ড্রাইভারকে একশত টাকার নোট দিয়ে বললাম যে, টেক্সির বুট উঠিয়ে ভান কর যে ইঞ্জিনে কোন ডিষ্ট্রাব হয়েছে। আমরা পনের বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি। সে হাসতে থাকল। যশোবন্ত নেশায় মাতাল হয়ে মরার মত রয়েছে। আমার সাথীও জানে না যে আমি কি করছি। আমরা উভয়েই সশস্ত্র। আমার সাথীর কাছে আছে দুই হাজার টাকা। তার থেকে টাকাগুলো নিয়ে নিলাম এবং আমার টাকাসহ একত্র করে মাতাল যশোবন্তের হাতে ধরিয়ে দিলাম। যশোবন্তকে আমার সাথী মাটিতে বসে ভর দিয়ে দাঁড় করালো। আমি জরিকে বললাম, যশোবন্তের একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যশোবন্তের বুকে মাথা রাখার জন্য। এখন চিত্রটি এমন যে উভয়েই বনের মধ্যে দাঁড়ানো এবং যশোবন্তের টাকা ধরা হাত জরির ঘাড়ের পিছন দিক হয়ে সম্মুখে তার শরীরের উপর রাখল। আমি সাথীর কাছ থেকে ক্যামেরা নিয়ে তার পুরো বারটি ছবি তুললাম। তারপর আমি যশোবন্তের হাত থেকে টাকা নিয়ে আমার পকেটে রেখে দিলাম।

এই কাজ সেরে যখন অমরা ফিরে এলাম তখন বড় জোর আধা ঘণ্টা হবে হয়তো। আমি টেক্সি ড্রাইভারকে চাউড়ী বাজার ফিরে যেতে বললাম।

সেই গলির কাছে গিয়ে জরিকে ফিরে যেতে বললাম। তখন সে বলল, আপনি আমাকে আমার কামরা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসুন। অন্যথায় পুলিশ বলপূর্বক তাদের সাথে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি জরিকে তার কামরায় রেখে ফেরৎ আসার সময় দেখতে পেলাম যে, সেই পুলিশ দু'জন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র পঞ্চাশ টাকা ঘুষের বিনিময়ে আসা-যাওয়ার সময় মুচকি হাসে। আমি টেক্সি ড্রাইভারকে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যেতে বললাম। রেলওয়ে স্টেশনে এই টেক্সি ছেড়ে দিয়ে অন্য এক টেক্সি নিয়ে যশোবন্তের বাসার দিকে যাত্রা করলাম। যশোবন্তের বাসার গলির কয়েক কদম দূরে টেক্সি থামালাম। আমি টেক্সিতে বসে থাকলাম, আর আমার সাথী যশোবন্তকে আড়কোলা করে তার বাসায় পৌঁছে দিল। যশোবন্তের মেয়ে দরজা খুলে দিল। আমার সাথী যশোবন্তকে তার মেয়ের কাছে সোপর্দ করে দ্রুত ফিরে এলো। যশোবন্ত তনয়া আমার সাথীকে কোন প্রশ্ন করল না। হয়তো বা তার চিরাচরিত নিয়ম যে প্রতিদিন নেশায় মাতাল হয়ে বাসায় ফিরে। আমি আমার সাথীকে পতিতাপল্লীর কাছেই নামিয়ে দিলাম এবং তার থেকে গ্রহণকৃত টাকা ফেরৎ দিয়ে বললাম, তুমি এই ফিল্ম ডেভেলপ করিয়ে প্রতি ছবির তিন কপি করে ধোলাই করবে। আমি আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় তোমার সাথে চাউড়ী বাজারের সেই রেষ্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করব। আমর সাথীকে বিদায় করে আমি টেক্সি ড্রাইভারকে নতুন দিল্লী যেতে বললাম। লুধি হোটেলের কিছু সামনে গিয়ে টেক্সি ছেড়ে দিলাম এবং টলতে টলতে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন বিকাল বেলা নির্দিষ্ট সময়ে আমার দুই সাথীর চাউড়ী বাজারের সেই হোটেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার কথা। তারা আমাকে দেখামাত্রই হাসতে হাসতে আমার পাশের সিটে বসে পড়ল এবং গত রাতের উঠানো বারটি ছবির একসেট আমার সামনে রেখে দিল। ছবি একদম পরিষ্কার উঠেছে, আর ফ্লাশ গানের কারণে পিছনের বনলতার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। বাকী দুই সেট ও নেগেটিভ সে সতর্কতামূলক বাসায় রেখে এসেছে। আর এই ছবির কারণে যশোবন্তকে আমার সামনে একদম অসহায় মনে হচেছ। তার দুর্বলতা আমার হাতে এসেছে। এখন আমার করণীয় হচ্ছে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সেই ছবি দেখিয়ে তার এমন এক ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে সে আমার কথা মানতে বাধ্য হয়। আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যশোবন্তের সাথে সাক্ষাত করতে দুই তিন দিন বিলম্ব করব। গত রাত সে এমন মাতাল ছিল যে, সে আমাদের কাজে কোন প্রকার বাধা দেয়নি। যদি

গতকালের ঘটনার কোন কথা মনেও পড়ে তবুও সে তা শুধু স্বপ্নই মনে করবে। যদি সবকিছু হুবহু মনেও পড়ে তদুপরি তার সাথে ঘটিত ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া সামলে নিবে। তৎক্ষণাৎ তার সাথে সাক্ষাৎ করাতে এও হতে পারে যে, সে ঘাবড়ে গিয়ে তার অফিসারদের সামনে নিজেই সবকিছু বলে দিতে পারে। তাই আমি তাকে কয়েকদিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম-এর অপেক্ষায় ফেলে রাখতে চাইলাম। যার ফলে আমরা ঐ রেষ্টুরেন্টে ২/৩ ঘণ্টা বসে থাকলাম। কিন্তু যশোবন্ত সে রাতে আসল না। তাছাড়া যশোবন্তের সাথে সেদিন রাতে যা কিছু হয়েছে তা আমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম ছিল না। শুধুমাত্র কাকতালীয়ভাবে প্রথম দিনেই সবকিছু হয়ে গেল। এখন আমাকে খেলায় জয়লাভ করতে হলে খুব দূরদর্শিতার সাথে খেলতে হবে। আমি সাথীদেরকে বললাম যে, সুইপারদের ফলোকারী সাথীকে নির্দেশ দাও যে তাদের কাজ দূরদর্শিতার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য। আমার ইচ্ছা, যদি আমি যশোবন্তকে কাবু করতে পারি তবে সুইপার দ্বারা কাজ তখনই শুরু করব। আমি উঠতে গিয়ে উভয় সাথীকে বললাম যে, আগামী দিন সকাল বেলা তোমরা যশোবন্তকে ফলো করবে এবং দেখবে যে, যশোবন্ত অফিসে যায় কি না। তার চেহারার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে। প্রতিদিন বিকাল বেলা এই রেষ্টুরেন্টে বসে যশোবন্ত আসার অপেক্ষা করবে এবং যখনই সে বালাখানার দিকে যাবে তখন একজন তার পিছু নিবে অন্যজন আমাকে আকবর হোটেলের লবিতে সংবাদ দিবে।

মোটকথা, রুটিন মত চারদিন যশোবন্তের অপেক্ষা করলাম কিন্তু যশোবন্ত চাউড়ী বাজারের দিকে গেল না। অন্যদিকে সুইপারদের পিছে নিয়োজিত সাথীরাও কোন উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করতে পারল না। এমতাবস্থায় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যশোবন্তের আগমনের অপেক্ষায় আমি সময় নষ্ট না করে নিজেই তার সাথে যোগাযোগ করব। আমি এক সাথীকে দায়িত্ব দিলাম যে, যশোবন্ত অফিস থেকে ফেরার পথে কোন বাসে তাকে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি বাস থেকে নেমে যাবে। অপর সাথী যশোবন্তের বাসার পেছনে চুপে চুপে পর্যবেক্ষণ করবে যে, যশোবন্ত বাড়ি যায় না চিরকুটে লেখা আদেশ অনুযায়ী সরায়ে বেরমখানের আগের স্টেশনের একদম সামনে এক রেষ্টুরেন্টের দিকে যায় এবং এও দেখবে যে, কেউ তার পিছু নিয়েছে কি না। চিরকুট আমি ইংরেজিতে লিখলাম (লেখা পরিবর্তন করে যে) সে বালাখানার বরাতে তার পরবর্তী ঘটিত ঘটনাবলীর আলোকে, তার পরিবারের কল্যাণে সে যেন বাসায় যাওয়ার পূর্বে রেষ্টুরেন্টে পৌঁছে। চিরকুটে

এটাও লিখলাম যে, এই চিরকুট তার হাতে পৌঁছার পর থেকে আমাদের সাথী তাকে ফলো করছে। সে যদি চিরকুটের নির্দেশের কোন প্রকার হেরফের করে তবে তার ও তার পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

এ সকল কাজ আগামী দিন হবে। আমি মিশনের পূর্ণতার জন্যে বাসে চিরকুট প্রদানকারী সাথীর এবং নিজেকে যশোবন্তের সামনে এক্সপোজ করাতে সম্ভাব্য সকল বিপদ মাথা পেতে নিচ্ছিলাম। আর এছাড়া কি বা করার আছে? সাথীদের সামনে আমার মত পেশ করলাম। সিদ্ধান্ত তো আমি নিজেই করেছি। তাদেরকে বলে নিয়ম পালন করা মাত্র সকলেই আমার মত মেনে নিল। সাথে সাথে এও বলল যে, যশোবন্তের সাথে সাক্ষাৎকালে তারা আমাদের দেখভাল ও হেফাজত করার লক্ষ্যে সশস্ত্র হয়ে আমার আশেপাশেই থাকবে। তাদের কথায় বুঝতে পারলাম তারা মিশনের সফলতা ছাড়াও আমার জীবনের যথাযথ হেফাজত করতে প্রস্তুত। আর এ কারণেই আমি আমার গ্রুপকে ফাইভমেন আর্মি উপাধি দিলাম। আমি ক্যামেরাম্যান সাথীকে বললাম যে, যখন আমি এবং যশোবন্ত রেষ্টুরেন্ট থেকে বের হব তখন সে যেন গোপনে আমাদের একটি ছবি তুলে ফেলে। আর তখন হয়তো সন্ধ্যা ছেয়ে যাবে, যার ফলে পূর্বের ন্যায় ফ্লাশ গান ব্যবহার করে। এ সকল উপদেশ দিয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

ভারতে আসার পর এই প্রথম আমি নিজেকে একজন মুসলমান ও পাকিস্তানী হিসাবে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করলাম। এতে সফলতা ও ব্যর্থতার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। আমি সম্ভাব্য সকল সমস্যার পথ বন্ধ করলাম। চিরকুট পাওয়ার পর যশোবন্তকে কোন প্রকার সুযোগ দেইনি যে, সে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে তার উর্ধতন অফিসারদের বলতে পারে। কিন্তু এও সম্ভব যে, যশোবন্ত অর্ধ বেহুঁশ অবস্থায় বনে তার সাথে ঘটিত সমস্ত ঘটনা স্মরণে এসেছে এবং সে তার উপরস্থ অফিসারদের বলে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে এবং বাস্তবেই পরদিন থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পণ্ড করে দেওয়ার জন্যে এবং আমাদের ধরাশায়ী করার লক্ষ্যে যশোবন্তের যথাযথ হেফাজত এবং দেখভাল করার জন্য কিছু লোক নিয়োজিত করে দিয়েছে। এরূপ সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আমি খুবই অবগত আছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে জানান দিচ্ছে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সফলতা হবেই। ট্রেনিং সমাপ্তির পর আমার সিনিয়র যে রিপোর্ট বিগবসকে দিয়েছিল, তা আমাকেও দেখানো হয়েছিল। সেই রিপোর্টের শেষ লাইনে যা লিখিত ছিল আজও তা আমার স্মরণে আছে। ইন

মাই অপিনিয়ন হি ইজ ইনডেজট্রাকটিবল অপটিমিষ্ট অর্থাৎ আমার ধারণা মতে এ এমন এক ব্যক্তি যার উপর আশা করলে তা ভাংবে না, আমাকে তো আমার সিনিয়রের একথার সম্মানও রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই বিশ্ব নিয়ন্তার প্রতি রয়েছে যিনি অন্তরের ভেদ সম্পর্কে অবগত। তাঁরই নামে মাতৃভূমির হেফাজতের জন্য আমি যা কিছু করছি। তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেই সত্তা খুব জ্ঞাত এবং আমার সফলতা অর্জিত হবে। আমি পরদিন যশোবন্তের পরিবারের সদস্য তার মেয়ে আশনা তার স্কুলের ছবি ও চিত্র একত্র করলাম। এ সকল চিত্র দিয়ে এ্যালবাম তৈরি করলাম। যশোবন্তের ছবিগুলোকে পৃথক একটি খামে রাখলাম। আমার পিস্তলটা লোড করে নিলাম। অতিরিক্ত কয়েক রাউন্ড গুলিও সাথে নিলাম। সকল প্রস্তুতির পর আমি সাথীদের বাসায় গেলাম। তারা প্রস্তুত হচ্ছে, আমি গ্রেফতার হলে আমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালানোর জন্য নিয়মানুযায়ী দায়িত্বভার অন্য এক সাথীকে বুঝিয়ে দিলাম। আমার সাথীদের কিছু ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে এবং হাসি ঠাট্টা করে তাদেরকে সক্রিয় করে তুললাম।

হোটেল থেকে আসার সময় সাথে করে আহমদ নগরের ফাইলের ফটো ফিল্ম এবং যশোবন্তের ছবির অবশিষ্ট দুই সেট এবং নেগেটিভও নিয়ে এলাম। এখন আমার কামরায় এমন কিছু নেই যা আমাকে শাস্তির যোগ্য করে তুলতে পারে। সর্বশেষ কথা বলে আমি সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিকাল চারটায় সরায়ে বেরমখানের ঐ রেষ্টুরেন্টের কাছেই চলে গেলাম যেখানে যশোবন্তকে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হয়েছে। একটু পরেই দেখতে পেলাম দুই সাথীকে। একজনের কাছে একটি ব্যাগে ক্যামেরা এবং ফ্লাশগান। আমরা একে অপর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে টংয়ের চা দোকানে বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার সেই সাথীও ফিরে এল যার দায়িত্ব ছিল বাসে যশোবন্ত কে চিরকুট দেয়া। সে এই চা দোকানের অদূরেই এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। ইশারাতে আমাকে কাছে ডাকল। আমি পায়চারি করতে করতে তার কাছে গেলাম। সে জানালো যে, যশোবন্ত চিরকুট দেওয়ার পর আমি বাসে গাদাগাদি করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে লুকিয়ে গেছি। তাছাড়া বাসে যাত্রীদের ভীড়ের কারণে যশোবন্তকে আমাকে দেখতে পারে নাই। অপর সাথী একই বাসের আরোহী হয়ে যশোবন্তকে ফলো করছিল। আমি তাকে জানালাম, দুই সাথী ইতিপূর্বে এসে গেছে। এখন শুধুমাত্র যশোবন্ত ও চতুর্থ সাথীর আসার অপেক্ষার পালা। আমরা আশা-নিরাশার ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত অবস্থায় যশোবন্তের অপেক্ষা করতে থাকলাম। বিকাল ছয়টার

দিকে আমার এক সাথী হোটেলের সম্মুখ দিয়ে চলতে চলতে শিস দিল। আমি তার দিকে তাকালাম। সে সম্মতিস্বরূপ মাথা দুলালো। এটা ছিল যশোবন্তের আগমনের পূর্বাভাস। গোধূলী বেলার ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে আমি যশোবন্তকে মৃতপ্রায় রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করতে দেখলাম। তার পিছনে রয়েছে আমার সে সাথী যে তার পিছু নিয়েছিল। আমি ছাপড়া হোটেল থেকে উঠে সেই সাথীর নিকট গেলাম। সে কানে কানে বলল যে, যশোবন্ত বাসার অনেক আগে এক স্টেশনে নেমে সরায়ে বেরমখানের বাসে সওয়ার হয়ে যায়। তাকে কেউ খেয়াল করেনি। সমস্ত রিপোর্ট ভাল পাওয়ার পর আমি রেষ্টুরেন্টের দিকে গেলাম।

রেষ্টুরেন্টে যশোবন্ত কর্ণারের এক টেবিলে বসেছে। আমি যখন তার টেবিলের খুব নিকটে পৌছলাম তখন যশোবন্ত আমাকে দেখেই আৎকে উঠল। যার ফলে ভয়ে তার হার্টবিট আরো বেড়ে গেল। পানির গ্লাস তার হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। আমি যশোবন্তের পাশের সিটে বসে পড়লাম এবং ওয়েটারকে কফি এবং কিছু স্নেক্স দেয়ার অর্ডার দিলাম। এই ঘাবড়ানোর ফলে যশোবন্ত নমস্কার ও কুশলাদি জিজ্ঞাসার কথাও ভুলে গেল। আমার চোখে চোখ রেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে বললাম, যশোবন্ত বাবু! আমিই আপনাকে এখানে ডেকেছি। আপনার সাথে আমার একান্ত কিছু জরুরি কথা আছে। যশোবন্ত আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যে সেদিন আমার সাথে বালাখানায় বসেছিলেন। আপনার নামটা যেন কি? আমি কিছু ধমকের সুরে বললাম, এই যশোবন্ত শোন! তোমার সাথে কথা বলার সময় তুমি কোন উচ্চবাচ্য করো না। এটা সুমীর বালাখানা নয় (সুমী তার প্রিয় নর্তকী)। আমার কথা মনোযাগ দিয়ে শোন এবং আমাকে তোমার ফায়সালা জানাও। তারপর এক এক করে আমি তার ছেলে মেয়েদের ছবি তার সামনে মেলে ধরলাম এবং তাদের নামও বলে দিলাম। তারপর তার মেয়ের স্কুল ও মেয়ের প্রেমিক আশনার ফটোও তার সামনে মেলে ধরলাম। এই ছবি দেখে যশোবন্তের কি প্রতিক্রিয়া হয় আমি তা দেখতে চাচ্ছিলাম। সে কিছু বলার পূর্বেই আমি তাকে বললাম যে, যশোবন্ত! আমি তোমার সম্পর্কে এবং তোমার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে এত কিছু জানি যা হয়তো বা তুমিও জানো না। আর তোমার ব্যাপারে বিশেষ 'একটি কথা' একথা বলেই তাকে বনের মধ্যে তোলা বারটি ছবি দেখালাম। যশোবন্ত একটি একটি করে ছবি দেখতে শুরু করল। যার ফলে তার পেরেশানি ও হার্টবিট উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। সবেমাত্র অর্ধেক ছবি দেখা হয়েছে এ

সময় সে হিম্মত হারিয়ে ফেলল। তার ললাট থেকে ঘাম টপ টপ করে ঝরতে শুরু করল। সাথে সাথে তার দেহেও শুরু হল প্রলয়ংকারী কম্পন। আমি ছবিগুলো তার সামনে থেকে তুলে ফেললাম। তখন যশোবন্ত ভয়ার্তকণ্ঠে বলতে লাগল, এই মেয়েকে (জরিকে) তো আমি একদম চিনি না। ভগবানের কসম! আমি কিছুই জানি না। সে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, আমি তো একজন গরীব মানুষ। সরকারী অফিসের চাকুরে। আয় ব্যয় সমান সমান। তারপরও বলুন আপনার ডিমান্ড কি? সে মনে করেছে যে, আমি তার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য তাকে ব্লাক মেইল করছি। আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, যদিও তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানি। কিন্তু তোমার মুখ থেকে সত্য কথা শুনতে চাই। তাই তুমি যে অফিসে চাকরি কর সেখানে তোমার ডিপার্টমেন্ট এবং পজিশন সম্পর্কে বল। তখন সে বলল যে, আমি মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে কপিং ব্রাঞ্চের সুপারেন্টেন্ড। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে এই স্বল্প বেতনে বালাখানায় আনন্দ-ফুর্তি কিভাবে কর? কাঁদ কাঁদ স্বরে জবাব দিল, বাড়ির খরচ তো আমার মেয়েই চালায়। বাকী ছেলেমেয়ে যারা লেখাপড়া করে তাদের ফিস ইত্যাদি আমি চালাই।

তারপর সে কাঁদ কাঁদ স্বরে মিনতি করে বলল যে, আমি একজন গরীব মানুষ, তবুও বলুন আপনার ডিমান্ড কি? এর সাথে সাথে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তো বলবেন কি, আপনি কি মিলিটারী ইন্টিলিজেন্স-এর লোক? একদিকে তুমি আমার ডিমান্ড জানতে চাও, তার পাশাপাশি তুমি আমার পরিচয়ও জানতে চাও। আমি তাকে শক্তভাবে বললাম। যশোবন্ত! আমি এখানে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে আসি নাই। তুমি চারদিক থেকে বন্দি। তোমার এই ছবি (এই বলে আমি ছবিগুলো দ্বিতীয়বার পকেট থেকে বের করে টেবিলে রাখলাম) তোমাকে ধ্বংস করতে যথেষ্ট। তুমি তোমার বাকী জীবন কারাগারে কাটাবে। এই মহিলার সাথে তোমার হাতে নোট ধরা অবস্থায় এই ছবিই তোমাকে কারাগারে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট। তোমার সন্তানাদি ও তোমার আত্মীয়-স্বজন যখন তোমার জীবনের এই অবর্ণনীয় অধঃপতন দেখবে তখন তারা তোমাকে ঘৃণা করবে, ধিক্কার দিবে। তোমার মেয়েরা কুমারীই থেকে যাবে এবং পরিশেষে ভেগে যাবে এবং শিক্ষিকা মেয়েকে বাইফোর্স বরখাস্ত করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে, যদি তুমি আমাকে সঙ্গ না দাও তাহলে তোমাকে রেষ্টুরেন্ট থেকে বের হবার সাথে সাথেই গুলি করে হত্যা করা হবে।

গুলির কথা শোনামাত্রই যশোবন্ত কাল বৈশাখী ঝড়ের মত থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি এও বললাম যে, এই এলাকার অধিবাসীদের বেশির ভাগই মুসলমান। তাই তোমার লাশ পর্যন্ত গায়েব করে দেয়া হবে। অফিস থেকে যে তুমি এখানে এসেছো তা কেউ জানে না। আমি এ কথার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য থেমে গেলাম। দেখি যশোবন্ত কি করে। যশোবন্তের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে, সে হার্টফেল করবে। সে কাঁপতে কাঁপতে বারবার এদিক সেদিক তাকাচ্ছে যেন এখনি কোথাও থেকে গুলি চলে আসবে। যা তার জীবনের সাঙ্গলীলা করে দেবে। যখন আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে, ভয়ে না জানি তার হৃদকম্পনই বন্ধ হয়ে যায় তখন আমি তাকে গ্লাস ভর্তি পানি দিলাম। সে পানি পান করল ঠিকই তবে তার আতংক ও কম্পন যৎসামান্যও কমেনি। আমি তাকে জানালাম যে, যশোবন্ত! দেখ, আমি যা কিছু বলছি সবকিছুই হতে পারে। আর যদি তুমি আমাদের সহযোগিতা কর তবে শুধুমাত্র এ সকল কাজ বর্জন করাই হবে না বরং সহযোগিতার সুবাদে তোমাকে বিনিময়ও দেয়া হবে। আশার আলো দেখার সাথে সাথে সে বলে উঠল, বলুন! আমাকে কি সহযোগিতা করতে হবে? আমি তাকে বললাম যে, সর্বপ্রথম বলো যে তুমি কতদূর সহযোগিতা করতে পারবে? দ্বিতীয়বার বলছি যে, আমাকে কোন প্রকার প্রশ্ন করবে না। শুধুমাত্র আমার প্রশ্নের জবাব দিবে। একদম সঠিক জবাব। তুমি একজন কপিং ব্রাঞ্চের সুপারেন্টেন্ড। তোমার কাছে আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে প্রেরিত চিঠি ছাড়াও বহিরাগত চিঠির কপি তৈরি করার জন্য এসে থাকে। সে মাথা দুলিয়ে সায় দিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাধারণত কি পরিমাণ ডাক তোমার সেকশনে আসে এবং কি পরিমাণ ডাক যায়? তবে মনে রেখ, তোমার অফিসে আগত ও প্রেরিত ডাকের বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে আছে। শুধুমাত্র জানতে চাচ্ছি যে, তুমি কতখানি সত্য কথা বল! যশোবন্ত এখন প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তারপরও আমি তাকে অতিরিক্ত ভীতি প্রদর্শনের জন্য বললাম যে, তোমার জীবন-মরণ এখন নির্ভর করছে একমাত্র তোমার সত্য বলা এবং আমাদের সাথে সহযোগিতা করার উপর। তাই প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে ভাল করে আমার কথা মনে রাখা দরকার। এ কথা বলে আমি তাকে একটি কফি দিতে চাচ্ছিলাম মাত্র। কেননা যশোবন্ত তো ব্রেকিং পয়েন্টে এসেই গেছে।

হিন্দুরা যদি কোন বস্তুকে বেশি ভয় করে থাকে তবে তা হল মৃত্যু। আর সেই মৃত্যুর ভয় থাকার কারণেই হাতে গোনা কয়েক হাজার ভিনদেশী

মুসলমান সৈনিকের শক্তিবলে ঘুরি, তুগলক, গোলাম, লুধি এবং মোগল শাসকগণ নির্ভয়ে বীরত্বের সাথে কোটি কোটি হিন্দুদের মহাভারতে বুকটান করে শাসন করেছেন। ইতিপূর্বে মোহাম্মদ বিন কাসিম ও সুলতান মুহাম্মদ গজনবী হিন্দুদের এই জন্মভূমিকে কম্পমান করে রেখেছিলেন। যার কারণ ছিল হিন্দুদের ভীরুতা ও মৃত্যুর ভয়। জীবন্ত মানুষকে জবাই করে তারা কালী মাতার কাছ থেকে শক্তি অর্জনের প্রার্থনা করে থাকে। কালি মাতার মূর্তিও তারা তাদের ভীরুতা দূর করার জন্য প্রস্তুত করেছে। কিন্তু এ পাথরের নির্মিত মূর্তিও তাদের ভয় দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে মুসলমানদের জন্য শাহাদতের মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মাইলফলক। মহিয়ান ও গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের মর্যাদাকে শুধুমাত্র মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং শহীদদের মর্তবা এত উঁচু যে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেন যে, 'শহীদদের মৃত বল না, তারা জীবিত আমি তাদেরকে রিযিক প্রদান করি'। বিচার দিবসে শহীদ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। শাহাদতের পর শহীদ সুউচ্চ মর্যাদা পাবে, যার ফলে সে বিধাতার কাছে বারবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে ও শাহাদাত লাভের জন্য আকুতি করতে থাকবে। পক্ষান্তরে হিন্দু, যাদের স্বর্গ ও নরকের বিশ্বাস আছে এবং তাদের বিশ্বাস মতেও নরকে শুধু আগুন আর আগুন। হয়তো বা সেই আগুনে অভ্যস্থ করার জন্যই তারা হিন্দুর মরা দেহকে ইহকালেই চিতার লেলিহান আগুনে প্রজ্জ্বলিত করে। জবাবে যশোবন্ত আমাকে জানালো যে, সাধারণত দিনে ত্রিশ থেকে চল্লিশটি পত্র বিভিন্ন ডিভিশন থেকে এসে থাকে। রেজিমেন্টাল এবং ব্রিগেডিয়ার হেড কোয়ার্টারে কারোরই পত্র লেখার অনুমতি নেই। আর আনুমানিক এই পরিমাণ পত্রই হেড কোয়ার্টার থেকে বাইরে যায়।

আমি তাকে ক্লাসিফাইড পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন জবাবে যশোবন্ত জানাল যে, ক্লাসিফাইড পত্র আমরা খোলা ব্যতীতই ডাইরেক্ট প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু পরবর্তীতে সে পত্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক্লাসিফাইড ফাইলে সংরক্ষণ করার জন্যে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, এসব কিছুর ইনচার্জ কি তুমি? জবাবে সে মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বলল। আমি তাকে আরো জিজ্ঞাসা করলাম যে, ক্লাসিফাইড এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র কি তুমিই টাইপ করো? জবাবে সে বলল যে, এমন পত্রাবলী একজন করণিক টাইপিষ্ট টাইপ করে থাকে। তবে কারেকশন-এর জন্য প্রথম আমার কাছে আসে। আমি ক্ষাণিক ভেবেচিন্তে যশোবন্তকে প্রশ্ন করলাম যে, সে

আমার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত কি না? জবাবে সে জানালো যে, এছাড়া আমার আর কি-ই বা করার আছে? আমি তাকে বললাম যে, অন্য আরেকটি ব্যবস্থা আছে, আর তা হল, রেষ্টুরেন্টের বাইরে তোমাকে গুলি করে তোমার দেহ খাঁচা থেকে প্রাণ পাখিকে বের করে দেয়া। এতে তুমি আমাদের সহযোগিতা করার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যশোবন্ত আমার হাত ধরে বিনয়ের সাথে বলল, না না স্যার! এমন কইরেন না। আমি আপনার সকল কাজ করতে প্রস্তুত। আমি যশোবন্তের চোখে চোখ রেখে বললাম, যদি তুমি জান বাঁচানোর জন্য আমার সাথে সহযোগিতার মিথ্যা অভিনয় করে থাক তবে তোমার এবং তোমার পরিবারের এমন ভয়ানক পরিণতি করব যা তুমি কখনও কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার সহযোগিতার প্রমাণ হিসাবে আগামীকাল অফিস থেকে ফেরার সময় ক্লাসিফাইড ফাইলের মধ্য হতে গত তিন মাসের পত্র বের করে একটি বড় খামে ভরে তোমার সাথে নিয়ে আসবে। সেই ডাক কে কোথায় তোমার থেকে নিবে তা এখন তোমাকে বলব না। আমাকে ছাড়া যেই তোমার থেকে ডাক উসুল করবে, সে তোমাকে অর্ধ ছবি দেখাবে। আমি তারই ছবিগুলোর মধ্য হতে একটি ছবি বের করে পুনরায় তাকে ছবির উপরের অর্ধেক দেখিয়ে বললাম, যে-ই তোমাকে এই ছবির উপরিভাগ দেখাবে ডাক খাম তাকে সোপর্দ করবে। এমন সময় কমপক্ষে এক ডজন লোক তোমাকে চোখে চোখে রাখবে এবং তোমার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করবে। যদি কোন প্রকার ছলচাতুরির চেষ্টা কর তবে সেখানেই তোমাকে খতম করে দেয়া হবে। আর এই ফাইলের মধ্য হতে আমাদের আকর্ষণ একমাত্র ওয়েষ্টার্ণ কমান্ড থেকে আসা ও পাঠানো পত্র ফাইল ভর্তি খাম পরদিন সন্ধ্যা বেলা ফেরৎ পাবে। ওয়েষ্টার্ণ কমান্ড শুনামাত্র যশোবন্ত আঁৎকে উঠল এবং ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কি পাকিস্তানী? জবাবে আমি বললাম, না আমি ভারতীয়। এর চেয়ে বেশি প্রশ্ন করার অনুমতি তোমার নেই। যদি তুমি আমাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পার তবে তোমাকে সবকিছু জানানো হবে। যশোবন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। তারপরও প্রশ্ন করল, স্যার! আমার এই সহযোগিতার বিনিময় কি হবে? আমি বললাম, যশোবন্ত! এগুলো তোমার সৎসাহস ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে যে, তুমি কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ পত্র আমাদেরকে দিতে পারবে। তখন বলতে পারব যে বিনিময় কি পরিমাণ হবে। যদি তুমি আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কোন পত্র দিতে পার তবে তার বিনিময় কয়েক গুণ হবে। আমি তাকে সতর্ক করে বললাম যে, তোমার অফিসের কপিং রুম যেখানে তুমি বস সেখানে আমাদের লোক

আছে। সে তোমার অফিসিয়াল চলাফেরার প্রতি নজরদারী করবে। তাই অফিসেও কোন প্রকার ছলচাতুরির চেষ্টা করবে না। আগামী দিন বিকাল বেলা তোমার প্রথম ইন্টারভিউ। আর এই ইন্টারভিউতে সফলতাই হবে তোমার জন্য আমাদের বিশ্বস্ততা লাভের প্রথম পদচারণা। এতে কোন প্রকার অলসতা ও বাহানার আশ্রয় নিও না। মোটকথা, এই দুই ঘন্টার সাক্ষাতে আমি যশোবন্তকে পুরোপুরিভাবে সর্বদিকে আমার পাতানো জালে বন্দি করে ফেললাম।

আমি বিল আদায় করে যশোবন্তকে বললাম যে, তুমি দশ মিনিট পর রেষ্টুরেন্ট থেকে বের হবে। দশ মিনিট পর যখন যশোবন্ত বাইরে এল, ততক্ষণে আমি আমার সাথীদের সাথে ছাপড়া হোটেলের কাছেই অন্ধকারে লুকিয়ে তাকে দেখতে ছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই বাস এল, সে বাসে উঠে পড়ল। আমরা একটি টেক্সি করে পুরাতন দিল্লীর দিকে যাত্রা করলাম। পথে আমাদের এক সাথী নেমে গেল। আমিও পতিতা পল্লীর আগেই নেমে গেলাম। তারপর এমনি একটি গলি চক্কর কেটে মেইন রোডে ফিরে এসে একটি টেক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সুইপারদের অনুসরণকারী দুইজন হতে একজনকে নির্দেশ দিলাম যেন সে যশোবন্তের বাসার গলির বাইরে চোখ রাখে। যদি অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ে তবে তা যেন নোট করে নেয় এবং চারটার পূর্বে বাসায় ফিরে আসে। অপরজনকেও আমি একই নির্দেশ দিয়ে আর্মি হেড কোয়ার্টারের বাইরে যশোবন্তকে ফলো করতে বললাম। যদি যশোবন্ত ছুটির পূর্বে একা বা অন্য কারো সাথে কোথাও বের হয় তবে দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু নিবে।

আমি হোটেলের বেডে শুয়ে শুয়ে পরদিন যশোবন্ত থেকে পত্র গ্রহন করার পরিকল্পনা আটলাম। এছাড়াও অন্য একটি বিষয় হল যে, আমি যশোবন্ত থেকে গ্রহণকৃত পত্রাবলীর কপি কিভাবে প্রস্তুত করব। যদি ফটো ফিল্ম বানাই আর এই জন্যে আহমদ নগরের ফটো গ্রাফারের কাছে যাই- যার কাছে ফাইলের কপি প্রস্তুত করেছিলাম তবে সে সন্দেহ করতে পারে। আর আমাদের কাছে এমন কোন শক্তিশালী লেজার ক্যামেরাও নেই যার দ্বারা পত্রাবলীর ছবি তুলে পাকিস্তান পাঠাতে পারব। আমি চিন্তার জালে ঘোরপাক খাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল চাঁদনী চকের এক ঠেলা গাড়িওয়ালার কথা। যিনি বড় সাইজের শ্লেটের দুই টুকরা- যার ফ্রেমের ভিতর মসৃণ কোন মেডিসিন ভর্তি ছিল। তন্মধ্য হতে লেখা কাগজ এক ফ্রেমে রেখে দ্বিতীয় ফ্রেম দিয়ে তাকে চাপ দিত অতঃপর সেই ফ্রেম দুটো পৃথক করে একটি সাদা

কাগজ প্রথম রাখতো। অতঃপর পুনরায় দ্বিতীয় ফ্রেম দিয়ে তাতে চাপ দিত। তারপর লেখার ফটোষ্ট্যাট দ্বিতীয় কাগজে পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠত। আমি অনেকদিন পূর্বে সেই ঠেলাওয়ালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক নজর তাকে ফটোষ্ট্যাট বের করতে দেখেছিলাম। আর আমি তাকে শুধুমাত্র তামাশা মনে করেছিলাম। এখন সিদ্ধান্ত নিলাম সকাল বেলা সর্বপ্রথম আমার কাজ হল সেই ঠেলাওয়ালার কাছে গিয়ে ফটোষ্ট্যাটকারী শ্লেট দেখা।

পরদিন সকাল দশটায় চাঁদনী চকে পৌছলাম। সে যথারীতি সেখানে ছিল। আমি তাকে আমার সাথে নেওয়া ইংরেজি পত্রের একটি পাতা দিলাম। সে দুই মিনিটের মধ্যেই ফটোষ্ট্যাট কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি আঙ্গুল দিয়ে খুব জোরে সেই কাগজ ঘষা দিয়ে দেখলাম যে, ফটোষ্ট্যাট লেখা উঠে কি না। ফটোষ্ট্যাট জাফরানী গাঢ় রংয়ের ছিল। ঠেলাওয়ালা আমাকে কালি ভর্তি একটি বোতল দিল। যখন লেখা অস্পষ্ট বের হতে থাকবে তখন বোতলের কালি দিয়ে তুলা ভিজিয়ে প্রথম শ্লেট মুছে দেওয়ার জন্য অতঃপর তা শুকানোর অপেক্ষা করতে বলল। একবার কালি ভিজানো শ্লেটে চল্লিশ কপির বেশি ফটো করা যাবে। মোটকথা, আমি যখন আশস্ত হলাম, তখন তাকে চার সেট শ্লেট এবং চার বোতল কালির মূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। একটি সমস্যা তো সমাধান হল। এখন দ্বিতীয় সমস্যা যশোবন্ত থেকে পত্র উসুল করা বাকী। যার ব্যাপারে বাস্তবিকভাবে আমি এখনও কোন ফায়সালা করতে পারি নাই। এই কাজে সার্বিক সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভয় রয়েছে যে, যশোবন্ত আমাদের ধরিয়ে দেয়ার কোন ফন্দি আঁটতে পারে। যশোবন্তের সামনে শুধু আমি দেখা দিয়েছিলাম। আমার সাথীদের ব্যাপারে তার ধারণা ছিল না। তাই আমার সাথীদেরকে রক্ষা করার জন্যে আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যশোবন্ত থেকে পত্র আমিই সংগ্রহ করব। আমার সাথীরা আমার হেফাজতের জন্য আশেপাশে থাকবে কিন্তু সামনে উপস্থিত হবে না।

আজকের দিনটি আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যশোবন্তের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া ফাইল ভর্তি প্যাকেটও আমাকেই গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে বারবার এ জল্পনা কল্পনা দানা বেঁধে উঠছে, যদি যশোবন্ত নিজের ব্যক্তিগত ভুলত্রুটি এবং দুর্বলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আমাদেরকে প্রদান করে সহযোগিতার কথা তার উপরস্ত অফিসারদের বলে দেয় তাহলে কি হবে? শুধুমাত্র আমাদের মিশনই ব্যর্থ হবে না বরং আমিও গ্রেফতার হব। এমতাবস্থায় আমার যে কি অবস্থা হবে তা আমার খুব

ভালভাবেই জানা আছে। বন্দি অবস্থায় ভারতের কঠিন নির্যাতনের কথা কল্পনা করতেই গা শিউরে উঠে। ভয়ের তীব্রতায় মেরুদণ্ডের হাড্ডি পর্যন্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়ে গেল। মৃত্যুর ভয় কখনো আমার ছিল না। কেননা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধেই তো আমরা সীমান্ত পড়ি দিয়েছি। ভয় শুধু এখানেই যে, আমি কি পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে পারব। মোটকথা, এমন অস্থিরতার পরও শক্তিহীন হলাম না। অতঃপর পিস্তল চেক করে লোড করে নিলাম। সাইনাইডের দাড়ির তারও ঢিলে করে নিলাম। যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে তাড়াতাড়ি তা গলাধকরণ করতে পারি। এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি যে, যশোবন্ত থেকে প্যাকেট কোথায় নিব। যশোবন্তের অফিস থেকে বাসাগামী বাসে প্যাকেট গ্রহণ করার কথা কল্পনাই করা যায় না। কারণ, যশোবন্ত যদি ডাবল রুল করতে চায় তবে বাসে পূর্ব থেকেই ভারতীয় কমান্ডো বসে থাকতে পারে। যে অনায়াসেই আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে। এখন বাকী শুধুমাত্র বাস থেকে বাসা পর্যন্ত যাওয়ার পথটুকু। বাস স্টেশন থেকে তার বাসার গলি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে। এ পথেও ভারতীয় কমান্ডো পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকতে পারে। তার বাসার গলিও একটি ফাঁদে পরিণত হতে পারে। যদিও আমার চার সাথীই আমার নির্দেশানুসারে বাস, রাস্তা এবং গলিতে অবস্থান করার কথা কিন্তু আমরা পাঁচজন সাইড আর্মস নিয়ে কমান্ডোর মোকাবেলায় পেরে না উঠারই কথা। ভেবেচিন্তে সর্বশেষ একটি মতই কিছুটা নিরাপদ বিবেচিত হল। আর আমি তদানুসারেই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

যাত্রার সময় ঘনিয়ে এল। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আমি সফলতার কামনা করে মহান প্রভুর দরবারে লুটিয়ে পড়লাম এবং যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের বাইরে দণ্ডায়মান টেক্সিগুলোর মধ্য থেকে একটি টেক্সি নিয়ে ক্লাট প্যালেসে গেলাম। সেখানে এই টেক্সি ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকটি টেক্সি নিয়ে যশোবন্তের বাসার গলির সামনে গিয়ে গতি মন্থর করে সামনের দিকে চলতে থাকলাম। আমার দুই সাথী সেখানে কর্তব্যরত ঠেলাগাড়িওয়ালাদের সাথে কাজে লিপ্ত ছিল। কিছুদূর সামনে গিয়ে এই টেক্সিও ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি টেক্সি নিয়ে যশোবন্তের বাসার গলি সংলগ্ন রোডে চলে আসলাম। টেক্সিটি এমনভাবে পার্ক করালাম যেখান থেকে বাস স্টেশন এবং আমার টেক্সির মধ্যখানে যশোবন্তের গলি পড়ে। টেক্সিটি স্টেশনের বিপরীতমুখী করে রাখলাম। আমাদের দীর্ঘক্ষণ

অপেক্ষা করতে হয়নি। অফিস রোডে চলাচলকারী বাস এসে গেল। তিন চারজন যাত্রীর সাথে যশোবন্ত এবং আমার দুইজন সাথীও নামল। অন্য যাত্রীদেরকে অসুবিধাকর মনে হল না। বাস সামনে চলে গেল। পূর্ব থেকে উপস্থিত দুই সাথী আমাকে বিশেষ ইঙ্গিতে যাবতীয় রিপোর্ট ভাল বলে জানিয়েছে। বাস থেকে অবতরণকারী সাথীদ্বয়ও ইঙ্গিতে রিপোর্ট ভাল বলে জানালো। আমি টেক্সি স্টার্ট করে ধীরে ধীরে সামনে বাড়াতে বললাম। যশোবন্ত ধীর পায়ে তার গলির দিকে আসতে ছিল। তার হাতে কাপড়ের একটি বড় থলে। দুপুরের খাবারের টিফিন বক্স রাখার কাজে সেটি ব্যবহার করে। গলিতে পৌঁছার পূর্বেই আমি টেক্সি একদম তার গা ঘেঁষে দাঁড় করালাম। আমাকে দেখে সে ইঙ্গিতে বাইরে আসতে বলল। আমি তার পিছু পিছু চলতে থাকলাম। গলিতে প্রবেশ করা মাত্রই সে থলের মধ্য হতে একটি বড় প্যাকেট বের করে আমাকে দিয়ে বলল, সকাল ৭.০০ টায় ফেরৎ দিতে হবে। এসব কিছুই আট-দশ সেকেন্ডে সম্পন্ন হলো।

প্যাকেট নিয়ে আমি দ্রুতগতিতে ফিরে চললাম। ততক্ষণে আমার সাথী গলির কাছাকাছি চলে এসেছে। তাদের ভয় ছিল আমি অপহরণ হয়ে যাই কি না। টেক্সি পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে প্যাকেটটি এক সাথীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, বাসায় যাও, আমি আসছি। ক্লাট প্যালেসে এসে পুনরায় টেক্সি পরিবর্তন করে হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলে যেতে যেতে আমি বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলাম, কেউ আমার পিছু নিল কিনা দেখার জন্য। মূলত কেউ পিছু নেয়নি। হোটেলে পৌঁছে আমি প্রশান্তির একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এ পর্যন্ত সব কাজই আমাদের পরিকল্পনা মাফিক চলেছে। আমি এক দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। অতঃপর শ্লেটের সেট চারটা এবং ক্যামিকেলের একটি বোতল নিয়ে সাথীদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাথীরা আমার অপেক্ষায় বসেছিল। তারা কেউই প্যাকেট খুলেনি, আমিই খুললাম। তার মধ্যে একটি বড় ফাইলে বহিরাগত ডাক ও অন্য এক ফাইলে প্রেরিত ডাক পেলাম। সব মিলিয়ে দু'শয়ের বেশি চিঠি পেলাম। আমি চিঠি পড়ার পূর্বে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম যে বহিরাগত পত্রে অফিসিয়াল নিয়ম অনুযায়ী ডাবল ফোল্ডিংয়ের চিহ্ন আছে কিনা। দেখলাম সবকটি পত্রে এই চিহ্ন আছে। পত্র সঠিক হওয়ার ব্যাপারে এটি একটি প্রমাণ। পক্ষান্তরে প্রেরিত পত্রে ফোল্ড নেই। প্রতিটি পত্রে টপ প্রিয়রিটি এবং কনফিডেনসিয়াল-এর সীল লাগানো রয়েছে। প্রেরিত পত্রগুলো হচ্ছে কার্বন কপি। আর

বহিরাগত পত্র হচ্ছে মূল কপি। সেগুলোর হেড লাইনে বিভিন্ন কোর এবং ডিভিশনের প্রতীক এবং নাম্বার ছাপানো রয়েছে। আর প্রেরিত পত্রগুলোর পত্র প্রেরণকারী অফিসারের নাম ও র‍্যাংক দস্তখতের স্থানের নিচে লেখা রয়েছে এবং তার নিচে টাইপিষ্ট এবং অফিস সুপারেন্টের নামের প্রথম অক্ষর লেখা আছে। সবদিক থেকে ডাক সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সাথীদের তা জানালাম। তারা আনন্দে তকবীর দিতে শুরু করল এবং অতিশয় বাড়িয়ে আমাকে এই সফলতার উপর মোবারকবাদ দিতে লাগল। আমি আনন্দিত হয়ে তাদেরকে মোবারকবাদ দিয়ে বললাম, এতবড় সফলতা টীমওয়ার্ক ছাড়া কখনো সম্ভব ছিল না। কাজেই এই সফলতার মোবারকবাদ পাওয়ার হকদার আমরা সকলেই। বাস্তবেই এটা আমাদের জন্যে অনেক বড় সফলতা। আমরা আর্মি হেড কোয়ার্টারে প্রভাব বিস্তার ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধারের সন্ধানে থাকতে হবে। আমি চার সাথীকেই শ্লেটে কপি বানানোর পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে উভয় ফাইলের কাগজপত্র তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম। তারা পূর্ণ মনোযাগ সহকারে কপি বানানোতে লেগে গেল। চার ঘণ্টারও অধিক সময় অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সকল কপি প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি যশোবন্তের ফাইলে পত্রাবলী পূর্বের ন্যায় রেখে দিলাম। আর যে কপি আমরা প্রস্তুত করেছিলাম তা পৃথক করে সংরক্ষণ করলাম। সফলতার আনন্দে দিশেহারা হয়ে আমরা খাবারের কথাও ভুলে গেলাম। যাবতীয় কাজ শেষে এক সাথী চা তৈরি করল। চা পান করতে গিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত একটি কল্পনা আমার মনে জেগে উঠল। ক্যামেরাম্যান ছাড়াও অন্য এক সাথীকে প্রস্তুত হতে বললাম। পূর্ব থেকেই তারা প্রস্তুত ও সশস্ত্র ছিল। ক্যামেরা এবং ফ্লাশ গান ব্যাগে নিয়ে তারা আমার সাথে রওয়ানা হল। যশোবন্তের বাড়ির গলিতে পৌছতে পৌছতে আনুমানিক রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেল। এই ছোট্ট গলিতে সরকারী লাইটগুলো মিটিমিটি জলে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছে। ক্যামেরাম্যান সাথীকে বললাম, তুমি যশোবন্তের ঘরের দরজার বাইরে আমার ও যশোবন্তের এমন পোজে ছবি তুলবে যে, আমার পিঠ আর যশোবন্তের চেহারা এমতাবস্থায় ফাইলগুলো আমি তাকে দিতে গিয়ে এমনভাবে ধরব যে ফাইল কোর এবং তার উপরের লেখা পরিষ্কারভাবে পড়া যায়। মূলত সাথীদের চা পান করতে গিয়ে আমার দৃষ্টি একটি ফাইল কোরে পড়ে। যশোবন্ত তার অফিসে তাড়াহুড়া করে লাল প্রচ্ছদ বিশিষ্ট একটি ফাইলে করে প্রেরিত পত্রের

কার্বন কপিগুলো নিয়ে এসেছে। প্রচ্ছদের উপর ক্যাপিটাল লেটারে কনফিডেনশিয়াল এবং ফাইল কভারের উপরি ভাগে ক্যাপিটাল লেটারে আর্মি হেড কোয়ার্টার লেখা রয়েছে। যে ফাইল কভারের উপরিভাগে ক্যাপিটাল লেটারে আর্মি হেড কোয়ার্টার লেখা রয়েছে সে ফাইল কভারই আমাকে এ কাজ করতে উৎসাহিত করেছে।

আমার সাথী যশোবন্তের বাসার সামনে গিয়ে ক্যামেরা ফোকাস করে তার অবস্থান নিল। অন্য সাথী পিস্তল বের করে আমাকে কভার দিচ্ছে। আমি যশোবন্তের ঘরের দরজায় লাগানো কলিংবেল টিপলাম। কিছুক্ষণ পর যশোবন্তের বড় শিক্ষিকা মেয়ে এসে দরজা খুলল। বলল, কাকে চাই? আমি বললাম, একটি জরুরি কাজে যশোবন্ত বাবুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। মনে হয় মেয়েটি শুয়ে পড়েছিল। বক বক করতে করতে ভিতরে চলে গেল। এর কিছুক্ষণ পর যশোবন্ত ধুতি ঠিক করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল। আমাকে দেখামাত্র তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিথর মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, বাবু। দেরিতে আসার কারণে ক্ষমা চাচ্ছি। ভোরবেলা আমাকে একটি জরুরি কাজে আগ্রা যেতে হবে। তাই ফাইলগুলো ফেরৎ দিতে এসেছি। এই কথা বলতে বলতে লাল প্রচ্ছদ বিশিষ্ট ফাইলটি প্যাকেট থেকে বের করলাম। যশোবন্তের হাতে দিতে গিয়ে বললাম, আপনার সহযোগিতা যদি সময় মত পাই তবে আমাদের পক্ষ থেকে আপনি কোন প্রকার পেরেশানীর শিকার হবেন না। ঠিক তখনি ফ্লাশ লাইট জ্বলে উঠল। যশোবন্তের মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল। একই সঙ্গে ধপাশ করে মাটিতে পড়ে গেল। আমি তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলাম। সে বারবার আমার ক্যামেরাম্যান সাথীর দিকে ইশারা করছিল, ছবি তুলেই ততক্ষণে সে মেইন রোডে চলে এসেছে। শুধুমাত্র তার ছায়ামূর্তিই দেখা যাচ্ছিল। আমি অন্যান্য ফাইল ও প্যাকেট কভার তার হাতে দিয়ে বললাম, কোন সমস্যা নেই। সে আমাদেরই সঙ্গী। যশোবন্ত ঘাবড়ে গিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলতে লাগল, সে ছবি তুলেছে। আমি মুচকি হেসে বললাম, হ্যাঁ! সে ছবি তুলেছে। এতে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক মজবুত হবে। যশোবন্তের সাথে গত ত্রিশ ঘণ্টায় যা কিছু হয়েছে এতে তার অবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। সে নতশিরে দু'পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলল না। আমি বললাম, পরশু সন্ধ্যা সাতটায় সরায়ে বেরামখানার সেই হোটেলে আপনার অপেক্ষায় থাকব। আপনি আপনার সাথে টপ প্রিয়রিটি এবং ক্লাসিফাইড গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত কাগজ

নিয়ে আসবেন। আপনি যখন আমাদের সাথে সহযোগিতা শুরুই করেছেন তবে এখন আর কোন সংশয়ের সুযোগ নেই। পরন্তু সাক্ষাতের পর আপনাকে সুমির বালাখানায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। এ কথায় তার চেহারায় নিরাশার মেঘ কেটে আশার আলো উকি দিল। আমি বললাম, যশোবন্ত! অপেক্ষা করা আমার একদম পছন্দ নয়। অতএব ঠিক সময়ে পৌছে যাবেন। আরেকটি কথা আমরা। একে অপরের বন্ধু। তবে আমার কথা মত কাজ করার সময় আমাকে বস মনে করবে। আর এতেই তোমার মঙ্গল। কিছুক্ষণ পূর্বে তার চেহারায় যে ক্ষীণ আশার আলো উঁকি মেরেছিল এ কথায় তা শেষ হয়ে গেল। আমি তাকে এ অবস্থায় রেখে চলে এলাম। যে আমাকে কভার দিচ্ছিল সে আগেই রাস্তায় পৌছে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা টেক্সি পেয়ে গেলাম। সাথীদেরকে তাদের বাসার নিকটে নামিয়ে দিয়ে আমি লুধি হোটেলের কাছাকাছি এসে টেক্সি ছেড়ে দিলাম এবং পায়চারি করতে করতে হোটেলে পৌছালাম।

মিশনে সফলতার পর আমার যাবতীয় ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে গেল। হোটেল লাউঞ্জে কিছু সময় বসার পর আমার কামরায় চলে এলাম। মিশনে সফলতার পর তার ক্রমধারা এবং যোগাযোগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন খুব সকালেই সাথীদের বাসায় চলে এলাম এবং ওয়ারলেসে কোড করে লাহোর খবর পাঠালাম। আমরা আর্মি হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ স্থাপন করেছি। গুরুত্বপূর্ণ কাগজের কপি পাঠানোর জন্যে দু'জন ক্যারিয়ার পাঠাতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তবে এমন অত্যাধুনিক ক্যামেরা পাঠালে ভাল হয় যার দ্বারা কাগজপত্রের ছবি তুলা যায়। আর ক্যামেরার জন্য অতিরিক্ত বেশ কিছু ফিল্ম পাঠাতে হবে। এই সংবাদ পাঠানোর পর সুইপারদের পিছে নিয়োজিত উভয় সাথীকে বললাম, যশোবন্ত আমাদেরকে শুধুমাত্র কপিং অফিস কাগজপত্র সরবরাহ করতে পারবে। সে তো হেড কোয়ার্টারের জেনারেল ও অন্য অফিসারদের কামরা পর্যন্ত যেতে পারে না। সেখানে শুধুমাত্র সুইপাররাই অফিস টাইমের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য গিয়ে থাকে। এদের মধ্যে জেনারেল ও অন্য অফিসারদের কামরা কারা পরিষ্কার করে থাকে, এদের দ্বারাই অফিসার কর্তৃক তিন টুকরো করে ময়লার ঝুড়িতে ফেলা নোটগুলো আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। হঠাৎ মনে হলো হেড কোয়ার্টারে তো অনেক সুইপার কাজ করে থাকে। তাদের মধ্যে জেনারেল ও অন্য অফিসারদের কামরা কারা পরিষ্কার

করে এ সম্পর্কে তথ্য যশোবন্তই আমাদেরকে দিতে পারবে। তাই প্রথম যশোবন্ত থেকেই এ সকল সুইপারদের নাম জেনে নিতে হবে। তারপর তাদের ব্যাপারে কাজ করা হবে। মূলত অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদেরকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন করতে হচ্ছে। যশোবন্তের সহযোগিতা পাবার পূর্বে আমরা হেড কোয়ার্টারে পৌছার জন্য চারদিকে হাত পা ছুঁড়ছিলাম। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত যশোবন্তই পৌছতে পারবে। আর পৌছতে না পারলেও ঠিকানা বলে দিতে পারবে। আমার সাথীরা সব সময় জীবন দিতেই প্রস্তুত। তবে তারা কখনো গভীর চিন্তাও করেনি, গ্রুপ লিডার-এর সাথে মতানৈক্য করেনি বা কোন পরামর্শও দেয়নি। হয়তো বা এটা তাদের ট্রেনিং ও কঠোর ডিসিপ্লেনের কারণেই হয়ে থাকে। কয়েকবারই আমি তাদের সাথে পরামর্শ করতে বসেছিলাম। কিন্তু তারা শুধু আমার কথার সাথে তাল মিলিয়ে গেছে। আমি সেখানে বসেই ফায়সালা করলাম যে এখন থেকে সুইপারের ব্যাপারে নিয়োজিত সাথীদের কাজ বন্ধ করে দিব। অথচ ইতিপূর্বে সাথীদেরকে সুইপারের ব্যাপারে কাজ দ্রুততর করতে বলেছিলাম। এখন তাদেরকে এর কারণ জানালে তারা আমার সাথে একমত হবে। আর এখানেই আমি আরেকটি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ভবিষ্যৎ পরামর্শে তাদেরকে শামিল করব। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমিই নিব।

কঠোর নির্দেশনাবলী দিয়ে আমাদের সীমান্ত পার করানো হয়েছে। সামরিক জওয়ানদেরকে ট্রেনিংকালীন নিজ অফিসারদের কমান্ড পালনে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অফিসারদের কমান্ড পালনে জওয়ানরা লাখ লাখ গোলা বৃষ্টির মাঝেও নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্রেনিংয়ের পর সার্ভিসকালীন এই নির্দেশের উপর কঠোরভাবে অনুশীলন করানো হয়ে থাকে যে, থিংক লেটার ওবি ফার্স্ট। আমার সাথীরাও সেই ট্রেনিংয়ের ফলশ্রুতিতে বিনা বাক্য ব্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যশোবন্তের সাথে সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে যদি ভাবি তবে আমার ভীতি বেড়ে যায়। যতদিন আমরা রিক্তহস্ত ছিলাম ততদিন আমাদের কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু যশোবন্তর সাথে সকল সম্পর্ক আমাদের জন্য বড়ই মূল্যবান এবং এই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে হিসাব করে কদম বাড়াতে হচ্ছে। যশোবন্ত থেকে প্রতিবার কাগজপত্র আদান প্রদানের সময় গ্রেফতার হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ, যশোবন্তের প্রতি পূর্ব থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রয়েছে। যার কারণস্বরূপ এক সীমিত বেতনভুক্ত সরকারী চাকুরের আউট অফ বাউন্ড এলাকার বালাখানার্তে সীমাতিরিক্ত যাতায়াত, মদের নেশায় মাতালাবস্থায় নিজের রহস্যের জট খুলে দেয়া, যশোবন্তের যুবক সন্তানাদির নিজ পিতার কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া বা মাতৃভূমির ভালবাসায় তার এই কর্মকে সুযোগ বুঝে কাজে লাগানো, যশোবন্ত আমার থেকে যে পরিমাণ অর্থ কড়ি পাচ্ছে তা অসতর্ক হয়ে বেপরোয়াভাবে খরচ করা ও ধরা পড়া, মোটকথা বিভিন্ন দিকের ভয় রয়েছে। যা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে আমাকে ফায়সালা করতে হচ্ছে। আমার প্রথম সিদ্ধান্ত হল, ব্যক্তিত্ব হিসাবে যশোবন্ত থেকে কাগজপত্র আদান-প্রদান করার পরিবর্তে ড্রপ পদ্ধতি অবলম্বন করা। অর্থাৎ কোন পাবলিক প্লেসে এমন কোন নিরাপদ জায়গা অনুসন্ধান করা যেখানে যশোবন্ত নির্দিষ্ট সময়ে কাগজপত্র রেখে দিবে। তারপর আমি এবং আমার সাথী পালা পদল করে সেখান থেকে প্যাকেট যশোবন্ত প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই উঠিয়ে নিয়ে আসব। এমনিভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা প্যাকেট রেখে দিয়ে আসব। অতঃপর যশোবন্ত সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আমি সাথীদের কাছে এ বিষয় উল্লেখ করলাম। তারা নিয়মানুযায়ী এই মতকে সমর্থন করল। পরদিন সন্ধ্যা বেলা আমাকে সরায়ে বেরামখানে যশোবন্তের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং আমাকে ড্রপ-এর জন্যে নিরাপদ স্থান নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া এখন আমার অনেক টাকার প্রয়োজন। যাতে করে যশোবন্তকে টাকার জালে আটক করতে পারি। এমন বিশেষ প্রয়োজনকালে সহযোগীদের সাথে আমার যোগাযোগ করার অনুমতি রয়েছে। আমি সাথীদের থেকে বিদায় নিয়ে কাপড়ের মার্কেটে গেলাম। নিরাপত্তার খাতিরে নাম উল্লেখ করছি না। দিল্লী পৌছার প্রথম দিকেই সহযোগীদের দোকানপাট ঠিকানা দেখে নিয়েছিলাম– যাতে করে প্রয়োজন মুহূর্তে অনুসন্ধানে সময় ব্যয় না হয়।

মার্কেটে পৌছে আমি সহযোগীর দোকানে গেলাম। চিরকুটে টাকার অংক ও আমার কোড নাম্বার লিখেছি। এটা হচ্ছে থান কাপড়ের মার্কেট। দোকানদারের আকার আকৃতি ও পরিচিত নাম আমাকে পূর্বেই বলে দেয়া হয়েছিল। তারপরও আমি দোকানদারের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। দোকানের অভ্যন্তরে এক কেবিনে সে বসা ছিল। আমি তার কাছে গেলাম। কুশল বিনিময়ের পর আমার সাংকেতিক নাম বললাম। সে চমকে উঠল, বলল, কি করতে হবে বলুন। আমি চিরকুটটি তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। চিরকুট পড়ামাত্রই সে একটি ডায়েরী বের করলো। সম্ভবত সেখানে আমার অবয়ব

আকৃতি ও কোড নাম্বার লিখিত ছিল। সে চিরকুট ডায়েরীতে রেখে ড্রয়ার খুলে বিশ হাজার টাকা বের করে আমাকে দিল। আমি তখনই দোকানদারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সম্ভবত পূর্বে কোথাও বলেছি যে এই সহযোগীদেরকে আমাদের সরকার বিদেশী কারেন্সীর মাধ্যমে আমাদের গ্রহণকৃত টাকা পরিশোধ করে থাকে এবং সহযোগীর কাছে আমাদের সরকারের অনেক টাকাই জমা থাকে।

মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসে আমি একটা টেক্সি নিয়ে সম্ভাবনাময় নিরাপদ স্থানের সন্ধানে যশোবন্তের অফিস ও বাসার রোডে কয়েক চক্কর লাগালাম। কিন্তু কোন স্থানই নিরাপদ মনে হল না। তাছাড়া অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে বাস থেকে বারবার অবতরণ করা তার অফিস সহযাত্রীদেরকে সংশয়ে ফেলতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যশোবন্তের সাথে আলোচনা করে ড্রপের স্থান নির্ধারণ করব। এরপর হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেলে সার্ভিস ক্লাবে কর্ণেল শংকরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। কর্ণেল শংকর লনের সেই নির্দিষ্ট কোণেই মদ্যপানে লিপ্ত। সে আন্তরিকভাবেই আমাকে খোশ আমদেদ জানাল এবং কয়েকদিন না যাওয়ার অভিযোগ করল। আমি বিশেষ কাজে বোম্বে গিয়েছিলাম বলে কেটে গেলাম। অতঃপর আলোচনা জমে উঠল। আব্দুল করিম তার নির্দিষ্ট স্থানে ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকবারই সে চোখ ও মুখ দ্বারা আমাকে ইশারা করল। সন্ধ্যার অন্ধকারের কারণে তা বুঝতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর টয়লেটে যাবার কথা বলে উঠে দাঁড়ালাম। সে আব্দুল করিমকে ডেকে আমাকে টয়লেটে নিয়ে যেতে বলল। আব্দুল করিমের সাথে কর্ণেল শংকরের বেড রুমের টয়লেটে গেলাম। আব্দুল করিম রুমে প্রবেশ করতে গিয়ে বলল, আপনার সাথে নির্জনে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। আমি তাকে বললাম, তোমার যে কথাই বলার আছে তা আগামীকাল এগারটায় লুধি হোটেলে আমার কামরায় গিয়ে বলতে হবে। আব্দুল করিম মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

টয়লেট থেকে এসে আমি কর্ণেল শংকরের আড্ডায় যোগ দিলাম। কর্ণেল শংকর আজ আমার অতীত জীবন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। আমি বললাম, কর্ণেল সাহেব! শুধুমাত্র নাম ও স্থানের ব্যবধান অন্যথায় আমার ও আপনার ইতিহাস একই। আপনিও ভালবাসায় ব্যর্থ হয়েছেন আমিও। আপনি আপনার ব্যথা মদ্যপানে ভুলে থাকেন। আর আমি বোম্বের চাকচিক্যে। তারপরও এটা যেহেতু আন্তরে বিষয় তাই মনকে মানাতে পারছি না। একাকীত্বে হৃদয়ের ক্ষত পুনরায় তাজা হয়ে যায়। কর্ণেল শংকর আমার থেকে বিস্তারিত জানতে

চাচ্ছিল। আমি কাহিনীর কোন আগা-মাথাই পাচ্ছিলাম না। কৃত্রিমভাবে চোখে হাত রেখে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললাম, কর্ণেল সাহেব! চাপাপড়া ছাই উস্কে দিয়ে আপনি আমার উপর বড়ই অন্যায় করেছেন। জানি না, কখন এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বিতীয়বার ছাই হবে। আপনি তো সৈনিক, মুহূর্তে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু তা আমার জন্যে বড়ই কষ্টকর। আমি এখন অনুমতি চাচ্ছি, এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কর্ণেল কয়েকবারই আমাকে বসতে বলল। আমি এমন অভিনয় করলাম যে, কর্ণেল সাহেব আমাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হলো। আমি কাঁদ কাঁদ অবস্থায় সেখান থেকে বিদায় নিলাম। আজকের দিনটি আমাদের খুবই কর্মব্যস্ততায় কাটল। হোটেলে ফিরে এসে জানলাম, রিসিপশনে আমার একটি ম্যাসেজ আছে আশার পক্ষ থেকে। সে আমাকে বাসায় টেলিফোন করতে বলেছে। আমি হোটেলের লবি থেকেই আশাকে টেলিফোন করলাম। সে বাসাতেই ছিল। তার মন খারাপ ছিল। জয়চান্দ ব্যবসার কাজে চাঁদিগড় গিয়েছে। তাই সে এখন আমাকে তার বাসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। আমি তখনই মন খারাপ হওয়ার বাহানা করে অপারগতা প্রকাশ করলাম। পরিশেষে আশা কোন উপায়ন্তর না দেখে বলল, আমি আপনার সাথে আপনার কল্যাণ কামনাতেই সাক্ষাৎ করতে চাই। তার এ কথা শুনে আমি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আশা আমার কল্যাণে কি করতে পারে? তার কাছে কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল, সাক্ষাতেই বলা যাবে।

পরদিন আমাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। এগারটায় আব্দুল করিম আসবে। সন্ধ্যাবেলা যশোবন্তের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। এরই মাঝে আবার সাথীদের সাথেও সাক্ষাৎ করতে হবে। আবার সরায়ে বেরামখানের প্রোগ্রাম সেট করতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থা হলে আমি আশার কথার কোন মূল্যায়ন করতাম না। কিন্তু শত্রুদেশে হিন্দু বেশে থাকছি। অধিকন্তু গোয়েন্দাদের অতি ক্ষুদ্রতম কথারও মূল্যায়ন করতে হয়। তাছাড়া আশার সম্পর্ক হল সেনাবাহিনী ও সিভিল অফিসারদের সাথে। তাই আমি আশাকে দুপুরে আশোকা হোটেলে লাঞ্চ করতে বললাম। কিন্তু আশা আপত্তি করে বলল, আশোকা হোটেলের স্টাফদের অনেকেই তাকে মিসেস জয়, বলেই জানে। তাই ক্লাট সারকাসের চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে সে দুপুর একটায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি আশার কল্যাণের কথায় আপসেট হয়ে পড়লাম। তাই ভেবেচিন্তে ভবিষ্যৎ পা বাড়ানোর পরিকল্পনা করে আমি কামরায় ফিরলাম।

পরদিন ঠিক এগারটা বাজে রিসিপসনিষ্ট আমাকে আব্দুল করিম-এর আগমনের সংবাদ দিল। আমি তাকে কামরায় ডেকে নিয়ে এলাম। সে সিভিল পোশাকে এসেছে। সে আমাকে অতিশয় ভদ্রভাবে সালাম করল। আমি তাকে সোফাতে বসতে বললাম। সে সংকোচ প্রকাশ করে বলল, না স্যার, আমি কার্পেটেই বসব। আমি তাকে বললাম, যদি আমার সাথে কথা বলতে চাও তবে আমি যা বলি তাই কর। আব্দুল করিম সংকোচে জড়োসড় হয়ে সোফাতে বসল।

আব্দুল করিমের চিত্র কোন অস্বাভাবিক কিছু না, বরং সমগ্র ভারতে মুসলমানদের একই অবস্থা। তাদের সাথে নিম্নস্তরের নাগরিকের আচরণ করা হয়। ভারতে মুসলমান হওয়াটাই বড় অপরাধ। আমি ভারতে অবস্থানকালে অনুভব করলাম যে হাতে গোনা কয়েকটি মুসলিম পরিবার ব্যতীত যাদেরকে সরকার কন্ট্রাকটারী দিয়ে ডেকোরেশন পিচ হিসাবে আন্তর্জাতিক মতবাদের সেক্যুলার নিযামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রপাগান্ডায় ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা অবর্ণনীয় এমন করুণ যে, ভারতে মুসলমানরা কোন চাকরি পায় না। যদি কোন মুসলমান সাধারণ দোকানদারীও শুরু করে তাহলে আশপাশের হিন্দু দোকানদাররা পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে কমিয়ে সেই মুসলমানের দোকান বন্ধ করে দেয়। এখানে আমি একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। যার সাথে আমার মিশনের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই, কিন্তু এটা ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের প্রতিচিত্র।

ভারতের এলাহাবাদের যুদ্ধে বন্দীদের দ্বিতীয় ক্যাম্পে ভারতের এক ব্যবসায়ী এবং বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ নেতাকে ব্রেনওয়াশ করার জন্য আনা হয়। সে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বলল যে, আপনারা অযথা ভারতের সাথে যুদ্ধ করে নিজের পরম প্রিয় জীবনকে ধ্বংস করছেন। ভারত সরকার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান সকলের সাথে একই আচরণ করে থাকে। আর এ কারণেই ভারতের 'লোকসভা' (ন্যাশনাল এসেম্বলীতে) ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য পৃথক কোন কোটা নির্ধারিত নেই। যেখানে পাকিস্তানও এমন করে না, এখানে মুসলিম অমুসলিমের কোন ভেদাভেদ নেই। সকলের সাথে একই রকম আচরণ করা হয়ে থাকে। যদি ভারতে মুসলমানদের সাথে একই আচরণ না করা হত তবে আমি আজ এমন উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারতাম না। এভাবে সে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা রাখল। সকলেই চুপ করে তার এই প্রলাপ শুনছিল। কিন্তু এক পাকিস্তানী সুবেদার পি.ও.ডব্লিউ। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে

গেল এবং প্রশ্ন করার অনুমতি চাইল। পরবর্তীতে আমি সেই সুবেদারের সাথে পাকিস্তানে সাক্ষাৎ করেছি। তার সাথে ঐ জাফরানীর কথোপকথন কিছুটা এরূপ ছিল।

সুবেদার : জনাব, ভারতে মুসলমানদের পরিমাণ কত?

ব্যবসায়ী : মুসলমান ভারতের মোট জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ।

সুবেদার : আপনি কি মুসলমানদেরকে মারশিয়াল রেক যুদ্ধবাজ জাতি মনে করেন?

ব্যবসায়ী : হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। মুসলমানরা মারশিয়াল রেক।

সুবেদার : আপনার কথামত ভারতের মুসলমানদের সাথে একই আচরণ করা হয়ে থাকে।

ব্যবসায়ী : এ কথাও ঠিক।

সুবেদার : জনাব, তাহলে বলুন যে আপনার দেশের শুধুমাত্র আবাদী জমির এক অষ্টমাংশ যুদ্ধবাজ মুসলমানদের ভাগে রয়েছে। তাছাড়া '৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গত ২৫ বছর আপনার সেনাবাহিনীতে কতজন মুসলমান জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছে? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, একজনও না। এ কথায় ব্যবসায়ী লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেল এবং তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে গেল।

পাকিস্তানী সুবেদারকে সত্য বলার দুঃসাহসিকতায় একুশ দিনের ডিটেনশনে নেওয়া হল। তার রেশন অর্ধেক করে দেয়া হল। আমি ভারতে অবস্থানকালে খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছি যে, ভারতীয় হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে অনর্থক শত্রুতা পোষণ করে। অযথা মুসলমানদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা এবং বিনা কারণে হত্যা করার সুযোগ হাত ছাড়া করে না। একজন হিন্দু যে কথা বলে সেই একই কথা যদি কোন মুসলমান বলে তবে হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত হানার ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়ে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু করে দেয়। যার মধ্যে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের থেকে কয়েকগুণ বেশি। দিল্লীতে আশোকা ও আকবর হোটেল ভারত সরকারের মালিকানাধীন। এই হোটেলে ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানদের জন্য 'গো-মাতার' গোশত প্রকাশ্য দিবালোকে পেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই গাভীকেই যদি কোন মুসলিম তরকারী বিক্রেতা তার তরকারী গাভীর গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য মৃদুভাবে লাঠিপেটা করে তবে হিন্দু ধর্মের গো-মাতার লাঞ্ছনার ধোঁয়া তুলে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া হয়। হনুমান

গোত্রে হিন্দু ধর্মে বানরও এক বড় দেবতা। ভারত সরকার সেই দেবতাকে প্রতি বছর চল্লিশ হাজারের অধিকসংখ্যায় ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বিদেশে বিক্রি করে থাকে– যারা সেই দেবতাকে দীর্ন-বিদীর্ণ করে। আমি বোম্বে থেকে বার চৌদ্দ মাইল দূরে ইলিফেন্ট দ্বীপে গিয়েছিলাম। যেখানে কোরদের নির্মিত আবাসস্থল ও গিরিপথ রয়েছে। সেখানে অগণিত বানরও রয়েছে, সেগুলো পিকনিককারীদের খাবার ছোবল মেরে নিয়ে যায়। এক মুসলমান কর্তৃক বানরকে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করার অপরাধে তাকে অন্যায়ভাবে বেধড়ক পিটানো হয়েছে। আর এ থেকেই আপনি ভারতের মুসলমানদের বর্ণনাতীত করুণাবস্থার কল্পনা করতে পারেন।

আমার কামরায় সোফাতে বসায় সংকোচতা আব্দুল করিমের মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। আব্দুল করিমের এই সংকোচতা দূর করার লক্ষ্যে আমি তার সাথে নিঃসংকোচে সরলমনে কথা বলতে শুরু করলাম। তার জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় আনালাম। তার ভয় ও সংকোচ দূর হলে তখন আমি তাকে বললাম, তোমার বিশেষ কথা কি বল। আব্দুল করিম তার পঞ্চইন্দ্রিয়ের শক্তি সঞ্চয় করে যা কিছু বলল তার মর্ম হলো, অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে করতে তার আজ করুণ অবস্থা। এখন আর নির্যাতন সহ্য করার একটু শক্তিও নেই। সে আঁখিযুগল থেকে অশ্রু ফেলে কাঁদতে কাঁদতে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে উঠিয়ে সোফাতে বসিয়ে দিলাম। হিন্দু অফিসারদের অকথ্য গাল-মন্দ ও নির্যাতনে এ মুসলমান সিপাহী এমন নিরাশ হয়েছে যে, আমাকে নরম করার জন্য হিন্দু প্রথানুযায়ী আমার পা স্পর্শেও দ্বিধা করল না। বলল, আমি তো ধুঁকে ধুঁকে মরতেই যাচ্ছিলাম। আপনার অমায়িক ব্যবহার আমাকে আপনার সাথে কথা বলতে সাহস জুগিয়েছে। কর্ণেলের সাথে আপনার কথোপকথনে আমি জানতে পেরেছি যে, বোম্বেতে আপনার চা ব্যবসা রয়েছে। আল্লাহর দিকে চেয়ে আমাকে বোম্বে নিয়ে যান। আমি আজীবন আপনার সেবা করব। কখনো আপনার কাছে কোন প্রকার অভিযোগ করব না। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আমি তোমার সব রকমের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আর আমি কোন আনাড়ীও নই। কিন্তু সেনা শিবির থেকে পলায়ন করার কারণে তুমি Deserfer পলাতক সৈনিক হয়ে যাবে। পুলিশ তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে। গ্রেফতার হলে দীর্ঘকালের জন্য জেলে যেতে হবে। অথবা আজীবন পলাতক হিসেবেই কাটাতে হবে। তাছাড়া পুলিশ সময়ে অসময়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে হয়রানি করবে।

ক্ষাণিক বিরতির পর তাকে পরীক্ষার জন্য বললাম যে, তুমি তো খুব ভালভাবেই দেখছ যে আমাদের দেশে মুসলমানদের সাথে কেমন অমানবিক দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমি একজন উদার মনের মানুষ। নিজ ধর্মের সংকীর্ণতায় আমি অসন্তুষ্ট। বোম্বেতে আমার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধবই মুসলমান। তাদের সাথে কথাবার্তার সুবাদে ইসলামের মহত্ত্ব ও উদারতার প্রবক্তা হয়ে গেছি। শুধুমাত্র দু-একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে আজও চুপ করে আছি। অন্যথায় কবে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলতাম।

আমার এ কথায় আব্দুল করিমের সাহস বেড়ে গেল। সে আমাকে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে লাগল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আমি ইসলামের অনেক গভীরে গবেষণা করেছি। তুমি এ বিষয় ছাড় এবং নিজের কথা বল। তুমি একজন ভদ্র পরিবারের সন্তান এবং নির্যাতনের শিকার। আমি তোমাকে সার্বিক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এজন্য তোমাকে আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হবে। আমার কথার জবাবে সে বলল, আমি ইংরেজি লিখতে পারি না। তবে হিন্দি এবং উর্দু লিখতে পারি। বললাম, আমার এমন একজন মানুষের প্রয়োজন যে তার মনের সকল কথা গুছিয়ে লিখতে পারে। তাহলে তুমি এই কাজ কর যে তোমার আবেগ উচ্ছ্বাস ও কাজের ব্যাপারে তুমি যা কিছু জান তা লিখে দাও। আমি তিন-চারদিন পর তোমার কর্ণেলের নিকট যাব। সেখানে সুযোগ বুঝে তোমার লেখা আমাকে দিয়ে দিবে। তবে মনে রাখবে, তা যেন তোমার কর্ণেল বা অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। তোমার লেখা থেকেই আমি আন্দাজ করব যে তুমি আমার কোন কাজে আসবে। এরপরই আমি তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব। যদি তুমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার তবে তোমার কল্পনাতীত সহযোগিতা করব। এরূপ আশা-নিরাশার কথাবার্তার পর আব্দুল করিমকে পাঁচশত টাকা দিয়ে বিদায় করলাম।

বেলা একটা ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে একটায় আশার সাথে চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে হবে। রেষ্টুরেন্টে পৌছে দেখি আশা আমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। কুশল বিনিময়ের পরপরই আশা আমার অবহেলার অভিযোগ করে বলতে লাগল, আপনার সাথে সাক্ষাতের পর আমি মনে করেছিলাম আমি আমার ঠিকানায় পৌছে গেছি। হয়তো বা আমার ধারণাটি ভুল ছিল। বোম্বের চমকপ্রদ রঙ্গিন জীবনযাপনে অভ্যস্থ এমন ব্যক্তির দৃষ্টিতে আমার মত অবহেলিত নারীর কি বা মূল্য থাকতে পারে। আমি শুধু শুধুই

আপনাকে নিয়ে আশার জাল বুনেছিলাম। এমনিভাবে আশা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অভিমানসুলভ অভিযোগ করল। আর আমি ভাবতে থাকলাম, সে কেন আমার কল্যাণবার্তা বলে না। যা সে গত সন্ধ্যায় টেলিফোনে আমাকে জানিয়েছিল। আমি ভাবলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আশাকে ভালবাসার সাগরে না ভাসাব ততক্ষণ সে আমাকে কিছুই বলবে না। তাই আমি আশার হাত আমার হাতে নিয়ে ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে বললাম, আশা! দেখ, প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা ও ব্যর্থতা থাকে। আমার দুর্বলতার মধ্যে বড় দুর্বলতা হলো আমি ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। যে ভালবাসার আগুন হৃদয়ে ধিকিধিকি জ্বলছে, সেই ভালবাসায় আমি সর্বদাই ব্যর্থ হই। হয়তো পূর্বেও তোমাকে বলেছি যে, যে মেয়ের সাথে আমি প্রেম করেছিলাম তার সাথেও মুখ খুলে ভালবাসার কথা বলতে না পারার কারণে সে অন্যজনের জীবন সাথী হয়ে যায়। সেই মেয়ের পর জীবনোদ্যানে এক শূন্যতা বিরাজ করছিল। যখনই তোমার সান্নিধ্য লাভ করলাম তখন ভেবেছিলাম হয়তো বা আমার জীবন নামক মরুদ্যানে বসন্তকাল ফিরে আসবে। কিন্তু আফসোস! তুমি তো বিবাহিতা, তুমি কিভাবে আমার জীবনসঙ্গিনী হবে? আমি প্রকৃতিগতভাবেই অনেক পজিটিভ। যদি তুমি আমার হৃদয় রানী হতে তবে তোমাকে ছেড়ে আমি কোন ক্লাবে বা পার্টিতে যেতাম না এবং তুমি ছাড়া অন্য কারো সাথে নাচতাম না, তোমাকেও নাচতে দিতাম না। আমি তাকে আরও বললাম, আমি ছোটবেলায় ফার্সীতে কিছু কবিতা পড়েছিলাম। আমি তোমাকে সেই কবিতা ও তার অর্থ শুনাচ্ছি।

আমি তোমার
তুমি আমার
আমি হব দেহ খাঁচা
তুমি হবে প্রাণ
বলিতে কেউ পারবে না তা
তুমি একা, আমি একা।

নারীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো কোন পুরুষের মুখ থেকে তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ও তার লাবণ্যের প্রশংসা শুনা। আমি কবিতার মর্মার্থ শুনাতে থাকলাম আর আশার হাতের মুষ্ঠি বন্ধন আমার হাতে আরও শক্ত হতে থাকল। আমি বললাম, আশা! দেখ, আমার জল্পনা ও কল্পনার পথে তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। তুমি আজ

এক পুরুষের বক্ষে আবদ্ধ থাকবে, কাল অন্য পুরুষের বাহুতে। কখনো কখনো স্বামীর সাথে কখনো বা বন্ধুদের সাথে। এ অবস্থায় কিভাবে আমরা একে অপরকে আপন ঠিকানা ভাবতে পারি।

আশার দু'নয়ন তার অবস্থার তিক্ততা সইতে পারল না। অনুশোচনার অশ্রু দু'চোখ বেয়ে পড়তে লাগল। আমি রুমাল দিয়ে তার অশ্রু মুছে দিলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলতে লাগল, ওয়ানুদ সাহেব! যুগ যুগ ধরে আমার হৃদয় যে কথাটি আমার মুখ থেকে বের করতে পারেনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে কথাটি আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। বিশ্বাস করেন, আমি আন্তরিকভাবে আপনার পূজা করি। প্রথম সাক্ষাত থেকেই আপনাকে হৃদয়ের অতল গভীর থেকে কামনা করছি। আপনাকে পাওয়ার জন্য কি পরিমাণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছি। হোটেলে আপনার কাছে পর্যন্ত এসেছি। ব্রিগেডিয়ারের ছেলের সাথে আপনার সাক্ষাৎ শুধুমাত্র এজন্যে করিয়েছি যে আমার প্রতি যেন আপনার ভালবাসার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ ছিল আমার ভুল। যার ফলে হিতে বিপরীত হল। আপনি আমার থেকে দূরে সরে গেলেন। এখন আমি আপনাকে এবং আপনার সততাকে চিনতে পেরেছি। যদি আপনি আমার অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেন তাহলে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারব যে, আজ থেকে না বরং এখন থেকেই আপনি এক নতুন পরিবর্তিত আশাকে দেখতে পাবেন। আমি বললাম, আশা এই সকল বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে পরিণত করা কঠিন। তারপর আবার তুমি বিবাহিতা, জয়চাঁদ কি তোমাকে এত সহজেই ছেড়ে দিবে? সে বলে উঠল, এ কথা বলার জন্যেই তো আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি। জয়চাঁদ মেসের ব্রিগেডিয়ারের সহযোগিতায় যার ছেলেকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছিলাম। এক বিশাল নিলাম খুবই কম দামে কিনে নিয়েছে। ব্রিগেডিয়ারকে পঁচিশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছে। আর নিলামে এক মন্ত্রীও জড়িত। নিলামের লভ্যাংশের অর্ধেক সে পাবে। আমার জিজ্ঞাসার পর আশা আমাকে জানাল যে, তার কাছে একটি ছোট টেপ রেকর্ড আছে। তাতে সে জয়চাঁদ ব্রিগেডিয়ারের ও মিনিষ্টারের যাবতীয় কথা রেকর্ড করেছে। কেননা কন্ট্রাকটরের ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার মিনিষ্টার এবং জয়চাঁদের সাক্ষাৎ জয়চাঁদের আলীশান বাংলোতেই হয়ে থাকে। আমি বললাম, আশা! গতকাল তুমি আমার কল্যাণের কথা বলেছিলে। বেশ ভাল, এই নিলামের আভ্যন্তরীণ বিষয় জেনে আমার কি কল্যাণ হবে?

আশা খুবই সরল মনে জবাব দিল, আমি কি আপনার কল্যাণ নই? এ কথার কোন উত্তর আমি দিতে পারলাম না। তখন আশাই বলল, এই রেকর্ডের কথোপকথনের কারণে জয়চাঁদ শুধু আমাকে মুক্তিই দিবে না বরং আমার মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে মোটা অংকের টাকাও দিবে। এরপর আমি আপনার সাথে আপনার মনমত জীবনযাপন করব। এ কথার জবাবে কি বলব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আশাকে বললাম, আশা! বাস্তবেই যদি আমার সাথে তোমার ভালবাসা হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্যাসেট আমাকে শুনাতে পার। আশা তখনী তার ব্যাগ খুলে মাঝারি সাইজের একটি টেপ রেকর্ডার বের করে আমাকে দিয়ে বলল, এই টেপ রেকর্ড ও ক্যাসেট উভয়ই আপনার। এখন তো আমি আপনার অনুমতি ব্যতীত একটি কদমও আর সামনে বাড়াব না। এদিকে আমার পেরেশানী ও চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কল্পনাতীতভাবে আশা তার ভবিষ্যৎকে আমার সাথে বেঁধে ফেলেছে। আমার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও তার নেই। আমি আশাকে বললাম, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। যদি কখনো অযাচিৎভাবে তোমার স্বামীর সাথে মুখোমুখি হয়ে যাই তবে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলবে। জবাবে আশা আমাকে জানাল, এখন থেকে আমি আমার স্বামীর সাথে বা অন্য কারো সাথে বাইরে বের হবো না। কিন্তু আমি দুই একদিন অন্তর অন্তর তোমাকে টেলিফোন করব তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে। ইতিপূর্বে আমরা খাবার সেরে ফেলেছি, এখন বিদায়ের পালা। রেষ্টুরেন্ট থেকে সর্বপ্রথম আশা বের হলো এবং তার গাড়িতে উঠে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। এর কয়েক মিনিট পরই আমি বের হয়ে টেক্সি নিয়ে সাথীদের বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি হোটেল থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই বের হয়েছি। পিস্তল এবং টাকা আমার সাথেই আছে। সাথীরা আমার অপেক্ষায় ছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা দুইটি টেক্সি করে সরায়ে বেরামখানের দিকে রওয়ানা হলাম।

আমরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৌছে গেলাম। হোটেলে অপেক্ষা করার পরিবর্তে সে এলাকাতে ঘুরাঘুরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে আগে পিছে চলতে থাকলাম। এটা হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এলাকাতে ছোট ছোট একতলা বাড়ি ও ছোট ছোট দোকান রয়েছে। এক দোকান থেকে আমরা এক বোতল ঠাণ্ডা দুধ পান করলাম। এরপর ফিরে এসে পূর্বের ন্যায় ছাপড়া হোটেলে আমাদের মোর্চা নির্ধারণ করলাম। এ

সময়ে পুলিশের একটি গাড়ী হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশেরা চা পান করল। দিল্লীতে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নিম্নশ্রেণীর গরীব সদস্যরা এমন সাধারণ হোটেলে চা পান করতে এসে থাকে। তাদের চলে যাওয়ার ক্ষাণিক পরেই যশোবন্তকে আসতে দেখলাম। তুলনামূলকভাবে আজ তাকে ভাল দেখা যাচ্ছে। সে রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করার দশ মিনিট পর আমি প্রবেশ করলাম। যশোবন্ত কর্ণারের এক টেবিলে বসেছিল। সে চায়ের অর্ডার পূর্বেই দিয়েছিল। চা পান করতে করতে একটি প্যাকেট সে কাপড়ের থলে থেকে বের করে আমাকে ধরিয়ে দিল। আর আমি সেই প্যাকেট তৎক্ষণাৎ জামার মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। প্যান্টের পকেট থেকে টাকা ভর্তি একটি খাম বের করে তাকে দিলাম। সে চাপাস্বরে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কত আছে? বললাম, পাঁচ হাজার। এ কথা শুনামাত্র যশোবন্তের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। সে খাম পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। আমি তখন তাকে বললাম যে, আজকে তো সুমীর কাছে যাবে। এতে সে কিছুটা লজ্জিত হলো। মৃদুস্বরে বলল, হ্যাঁ। আমি তাকে বললাম যে, প্যাকেট পূর্বের ন্যায় ফিরে পাবে। তখন সে বলল যে, আমি সুমীর ওখানে বারটা পর্যন্ত থাকব। ফেরার পথে যদি বাসার ধারে পেয়ে যাই তবে খুব ভাল হয়। কেননা, আমার পরিবার দেরীতে বাসায় ফেরার কারণে আমার প্রতি পূর্ব থেকেই অসন্তুষ্ট। তারপর আমি আসার পর যদি কেউ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে এতে তারা খারাপ মনে করে। যশোবন্ত রহস্যভেদীর ভঙ্গিতে বলল যে, সন্তান যদি বড় হয়ে যায় তবে বৃদ্ধ বাবা-মাকে একদম ভ্রুক্ষেপই করে না। আর তাদের এহেন আচরণই আমাকে সুমীর কাছে যেতে বাধ্য করেছে। আর যা কিছু হই আমি তো একজন মানুষ। সারাটা দিন অফিসে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাই। বাসায় আসার পর ছেলেমেয়েরা কথা বলে না। সারাদিন অফিসে কাজ করে বাসায় ফেরার পর যদি কেউ কথা না বলে, এরূপ কতদিন সহ্য করা যায়!

আমি উঠতে উঠতে তাকে একটি থাপ্পড় দিয়ে বললাম, এ বালাখানা আবাদ করায় পরিবারের সদস্যদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অন্যথায় কোন ব্যক্তিই তার টাকা পয়সা, সময় ইত্যাদি সেই নৃত্যশিল্পীদের মোহনীয় আওয়াজে ব্যয় করতে পারে না। এটা জানা সত্ত্বেও যে বালাখানার শিল্পীদের হাসি-তামাসা, আনন্দ-ফূর্তি সব কিছুই কৃত্রিম বানোয়াট। এটা শুধুমাত্র টাকা আদায়ের ফাঁদ। এমনি এমনি কোন মানুষ বে-অকুফ হতে পারে না।

যশোবন্ত উঠার পূর্বেই আমি বেরিয়ে এলাম। সাথীদের জানা ছিল যে সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত হবে। তারা পূর্ব থেকেই দুইটি টেক্সি ঠিক করে রেখেছিল। আমরা সেই টেক্সিতে করে সাথীদের বাসার নিকটে এসে নামলাম। এবারেও যশোবন্তের প্যাকেটে পেলাম পূর্বের মত কনফিডেনশিয়াল ও টপ প্রিয়রিটির সীলাংকিত পত্র। আমরা পত্রের কপি বানাতে শুরু করলাম। পত্র সর্বমোট পঞ্চাশের মত হবে। আমার সাথীরা কপি বানাতে থাকল। আমি খাটে সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাতে প্যাকেট ফেরৎ দিতেও আমাকেই যেতে হবে।

শুক্রবার রাত্রি। যশোবন্তকে আমি শনিবার দুপুর তিনটায় গুলচা সিনেমার রেষ্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে বলেছি। সেখানে তার থেকে নতুন প্যাকেট সংগ্রহ করা ছাড়াও তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম। তাছাড়া আগামী সোমবার আমাকে পাকিস্তানী কনটাক্টর-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। রাত সাড়ে এগারটা বাজে। আমি কাগজের প্যাকেট নিয়ে যশোবন্তের বাসার দিকে চললাম। নিয়মানুযায়ী আমার এক সাথী আমাকে হেফাজতের লক্ষ্যে আমার সাথে চলল। পুরাতন দিল্লীর এ এলাকাটি হচ্ছে হিন্দু অধ্যুষিত। ফলে রাত নামার সাথে সাথেই একদম নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। একটি বিষয় আমি খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছি যে, ভারতীয় হিন্দুদের অনেকেই ঢাকা পতনের সফলতায় আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছে। সিংহকে তারা আহত করেছে বটে কিন্তু এই ভেবে তারা আতংকিত– না জানি আহত সিংহ প্রতিশোধ নিতে আবার কখন আক্রমণ করে বসে। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগও ভালভাবেই অবগত যে, পাকিস্তান তাদের যুদ্ধ বন্দীদের ঘাটতি পূরণের জন্যে চারটি নতুন ডিভিশন প্রস্তুত করেছে যারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। তারপর এখন পাকিস্তানকে আর বাংলাদেশকে দমন করার লক্ষ্যে শক্তি ব্যয় করতে হবে না। তাদের সমুদয় শক্তি এখন পাকিস্তানকে সংরক্ষণের জন্যে ও বাইরের শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত। দিল্লীতে লোকমুখে এমন কতগুলি গুজব রটেছে যে, পাকিস্তান পূর্ণশক্তি নিয়ে ভারতে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। পাকিস্তানের ছত্রীসেনা দিল্লীতে নামানো হবে। আর স্বাধীনতাকামী শিখ সম্প্রদায় পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করবে। দিল্লীতে প্রতি রবিবার বিমান হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাইরেন টেস্ট করা হচ্ছে। ভারত সরকার ভারতীয় হিন্দুদের মন ও মগজ থেকে এই ভীতি দূর করার জন্যে সম্ভবত '৪৭ সালে পাকিস্তান সীমান্তের অদূরেই পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

অথচ সে কয়েক বছর পূর্বেই পারমাণবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। তাদের এই সফলতাকে গোপন রাখা হয়েছে।

ভারতীয়দের বিস্ফোরণ ঘটানোর সাথে সাথেই পাকিস্তানও এটমি রিসার্চ জোরদার করে দিল। ভারতের ধারণা অনুযায়ী তেল সম্পদে পরিপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিবিয়া। কর্ণেল গাদ্দাফীর আদেশেই ইউরোনিয়াম ২৩৮-এর খাম পদার্থ ভর্তি বিশটি ট্রাক দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রাকালে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। যার মধ্য হতে 'লদাখাম ইউরোনিয়াম' পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ সংবাদ আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম ডাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করছে। আর এর উপর ভিত্তি করেই 'ইসলামী বম'-এর গুজব ছড়ানো হচ্ছে। পাকিস্তান যা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে নাই। আর এ ভয়ই ভারতীয় হিন্দুদের মাঝে বিরাজমান। পাকিস্তান ছত্রীসেনার ভয়েই মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা সন্ধ্যার সাথে সাথেই নিজ ঘরে আত্মগোপন করে। আমরা যখন যশোবন্তের বাসার সড়কে পৌঁছলাম, তখনও দুই একটি টেক্সি ও স্কুটার চলছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। এবার আমরা টেক্সি না ছেড়ে টেক্সিতেই বসে থাকলাম। একটু পরই যশোবন্তের গলির সামনে একটি স্কুটার এসে দাঁড়াল। তবে ভেতর থেকেই যশোবন্ত মাতালাবস্থায় হেলে দূলে বের হল। আমি প্যাকেট নিয়ে দ্রুতগতিতে তার পিছু নিলাম। শরাব ও সুমীর নৃত্য তার নেশাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। সে হেলে দুলে গুনগুনিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছে। আমি তার কৃত্রিম আনন্দ ছিনাতে চাইলাম না বিধায় তাকে প্যাকেট ধরিয়ে দিলাম ও পরদিন গুলচা সিনেমায় সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম। সাথীদেরকে তাদের বাসার নিকটে নামিয়ে দিলাম। আর আমি ক্লাট প্যালেসে টেক্সি পরিবর্তন করে হোটেলে এলাম।

পরদিন সকাল বেলায় আমি আশার প্রদানকৃত ক্যাসেট কয়েকবার শুনলাম। ক্যাসেটে তিনজন লোকের আওয়াজ আর গ্লাসের ঝনঝনানি শুনা যাচ্ছে। কখনো আশার আওয়াজ ভেসে আসছে। তারা নিলাম সংক্রান্ত কথাবার্তা ও লাভ সম্পর্কে আলোচনা করছে। এ আলোচনায় শুধুমাত্র একটি কথা এমন রয়েছে যাতে আশার কথার সত্যতার প্রমাণ মিলে। সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার বলছে, স্যার নিলাম তো আমি দিয়ে দেব। কিন্তু অন্যরা যদি হট্টগোল করে এবং শেষ পর্যন্ত তা তদন্ত পর্যন্ত গড়ায় তখন কি হবে? তার কথা অন্য একজন নাকচ করে বলল, ব্রিগেডিয়ার তার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না, এটা আমার দায়িত্ব। আর জয়চান্দ নিলাম পাওয়া মাত্রই তোমার

অংশ আদায় করে দিবে। জয়চান্দের সাথে আমার শেয়ার আছে। নিলামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমার লভ্যাংশ পাব না। সম্ভবত ইনি মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এ ক্যাসেটটি আমাদের দারুণ কাজ দিবে কিন্তু তার জন্যে আশার সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যদি সে আমাদেরকে টেন্ডারের সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেয় তবে জয়চান্দ ব্যতীতই ব্রিগেডিয়ার এবং মিনিষ্টারকেও কাবু করতে পারব। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আশার সাথে এ ব্যাপারে আগামী সোম-মঙ্গলবারে ফোনে কথা বলব। সোমবারে তো আমাকে পাকিস্তানী Contackt এর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। তার পরেই আশাকে ফোন করতে পারব। তাছাড়া নিলাম সম্পর্কে আমার কোন তাড়া ছিল না। এটা এখনো প্রথম পর্যায়েই রয়েছে। ঠিক দু'টায় আমি গোলচা সিনেমায় পৌছলাম। ভারতীয় ছবি সবেমাত্র রিলিজ হয়েছে। সিনেমায় দর্শকদের উপচে পড়া ভীড়। গোলচা সিনেমার বিল্ডিং-এ একটি উন্নতমানের হোটেল রয়েছে। আমাকে যশোবন্তের সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ করতে হবে।

রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যশোবন্ত পূর্ব থেকেই একটি টেবিল দখল করে বসে আছে। নানা রকম খাবার তার সামনে সাজানো রয়েছে। তাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছে। কুশল বিনিময়ের পর যশোবন্ত বলল যে, বাসায় তো সাধারণত ডাল সবজিই পাকিয়ে থাকে। তাই কখনো রেষ্টুরেন্টে এসে মনের মত খাবার খেয়ে থাকি। সুমির ওখানেও ভাল খাবার জুটে। আমি তাকে উপহাস করে বললাম, সুমির ওখানের খানাতো অবশ্যই মজাদার হবে। কারণ, সুমির সংস্পর্শে তা আরো সুস্বাদু হয়ে যায়। এতে যশোবন্ত কিছুটা লজ্জিত হল। যেহেতু আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে তাই সে অকপটে বলতে লাগল, সুমি গত রাতেও আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সুযোগ হলে ঐদিকে একবার ঘুরে আসবেন। জবাবে আমি বললাম, যশোবন্ত! খামাখা কেন নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করছেন? ঐ বালাখানাতে দেখার মত একমাত্র সুমিই আছে। যদি আমি যেতে শুরু করি তবে তার সান্নিধ্য আপনার ভাগ্যে জুটবে না। তার চোখ ধাঁধানো রূপ, হৃদয়ে সাড়া জাগানো চাহনি, শুধুমাত্র দর্শকদের থেকে টাকা লুটার জন্যে। প্রথম দিন একমাত্র টাকার জোরে অন্য সকল দর্শককে কেটে পড়তে বাধ্য করেছিলাম। যদি আবার সেখানে যাই তবে তোমাকেও কেটে পড়তে হবে। কাজেই আপনি একাই সেখানে গিয়ে আপনার একাকীত্ব দূর করুন। এর জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা আমার পক্ষ থেকে চালু থাকবে।

আপনি আমার প্রয়োজন মিটাতে থাকুন আমিও আপনার প্রয়োজন পূরা করব। তবে এ কথাটি খেয়াল রাখবেন, নর্তকীদের প্রাসাদে কোটিপতিও যদি পানির ন্যায় টাকা ব্যয় করতে থাকে তবে এক সময় তা শেষ হয়ে যাবে। পর মুহূর্তে তাকে নিঃস্ব ও অপমানিত হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। টাকা বিনে সেখানে কারো কদর নেই। কাজেই আপনি অর্থকড়ি খুব ভেবেচিন্তে ব্যয় করবেন। ব্যয় খুব সীমিতভাবে করবেন। তবে এমন ভাব দেখাবেন যে, আপনার কাঁছে অঢেল সম্পদ আছে। দেখবেন নর্তকীরা ভিখারীর ন্যায় আপনার চারধারে ঘুর ঘুর করছে।

যশোবন্ত চুপ করে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে ছিল বটে কিন্তু লজ্জায় তার চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। কারণ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রেম বিনিময় থেকে দূরে থাকা তার সাধ্যের বাইরে। আর আমার কামনাও ছিল তাই, যেন সুমির মোহে পড়ে যশোবন্ত আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে বাধ্য হয়। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই। এজন্য আমি সুযোগ বুঝে বললাম, যশোবন্ত সাহেব! আপনার পছন্দও অতুলনীয়। সুমির উপর শুধু ভালবাসার বুলি ছুঁড়লেই চলবে না বরং আন্তরিক ভালবাসা ও অর্থ উভয়ই কুরবানী করতে হবে। তবেই সুমির প্রেমের নাগাল পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। এতে যশোবন্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠল, অনুদ ভাই! সুমিকে পাওয়া এখন ভগবান আর আপনার হাতে। গতকালের ডাক আপনার কাছে কেমন লেগেছে? প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, তেমন বিশেষ কিছু না। সাধারণ ডাকের চেয়ে একস্তর উপরে মাত্র। মূলত এ ডাক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্মি হেড কোয়ার্টারের একটি পত্র মারফত ভারতের সাত নম্বর ও দশ নম্বর ডিভিশন কমান্ডারদেরকে অবগত করা হয়েছে যে, শিখ লাইট ইনফেন্ট্রির সকল রেজিমেন্টকে (যাদের সংখ্যা পয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি ছিল) এক মাসের ভেতর তাদের ডিভিশন থেকে বদলি করে ত্রিপুরাতে অবস্থানরত জাট রেজিমেন্টের (সদস্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার) স্থলে পাঠানোর জন্যে। ভারতের সাত নম্বর ও দশ নম্বর ডিভিশন পাক সীমান্তের নিকটে নিয়োজিত রয়েছে। যশোবন্ত বললেন, আমি যখন আপনার জন্য এত বড় রিস্ক নিতে পেরেছি তবে শেষসীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। শুধু আপনি আদেশ করে যাবেন আমি জীবন বাজি রেখে তা পালন করব।

হঠাৎ একটি কথা আমার মনে পড়ল। যশোবন্তকে বললাম, তারাপুরের এটমি বিদ্যুৎ ঘর থেকে রেডিয়াম দ্বারা সংরক্ষিত ট্রাক টাটা নিয়মিতভাবে

রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যায় এবং তার সিকিউরিটির দায়িত্ব থাকে সেনাবাহিনীর কমান্ডোর উপর। তারাপুরের এটামি প্লান্টও তাদের যিম্মায় রয়েছে। আর এ সুবাদেই এটমি প্লান্ট এবং টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর কিছু ফাইল অবশ্যই হেড কোয়ার্টারে থেকে থাকবে। রিসার্স ইনস্টিটিউটের কর্মতৎপরতা সম্পর্কেও হেড কোয়ার্টারকে অবহিত করা হয়ে থাকে। এ সকল ফাইল আমার প্রয়োজন। একথা শুনে যশোবন্ত চুপসে গেল। চিন্তিতভাবে মাথায় হাত রাখল। আমি অনীহা প্রকাশ করে বললাম, আমি তো এমনিতেই এ কথা আপনাকে বলেছি। নচেৎ পারমাণবিক এটমি বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে এবং আমরা বিস্তারিত রিপোর্ট পাচ্ছি। সে সকল তথ্য যাচাই করার জন্যেই শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। তবে এ কাজের বিনিময়ে আপনি পেতে পারেন টাকার মোটা একটা অংক। এই বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম। তখন যশোবন্ত বলল, এমন দুটি ফাইল জেনারেল সাহেবের হেফাজতে রয়েছে। আমি কপি ব্রাঞ্চের সিনিয়র এবং সুপারেন্টেন্ড হওয়ায় ঐ ফাইল সংক্রান্ত ডাক টাইপ করার জন্য জেনারেল সাহেব আমাকে ডেকে থাকেন। জেনারেল সাহেবের কামরার টাইপ রাইটারে আমি টাইপ করি এবং কপিসমূহ ফাইল বন্ধ করি। ফাইল দুটির সাবজেক্ট একই। জেনারেল সাহেবের নির্দেশনানুসারে বহিরাগত প্রতিটি ডাকের জবাবী কপি তার সাথেই স্ট্যাপল দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। জেনারেল সাহেবের টাইপ রাইটার বিদ্যুতে চলে এবং তার কামরায় ফটোষ্ট্যাট মেশিন থাকায় কার্বন কপি করা হয় না। আমি বললাম, ফাইল পর্যন্ত পৌঁছাতে কোন সমস্যা নেই। সেই ফাইল পর্যন্ত পদার্পণই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিধায় এ কথা আপনি ভুলে যান। এখন বলুন, জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার এবং অন্য সিনিয়র অফিসারদের অফিসের সুইপার কারা? আমরা তাদের ময়লার ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত কাগজ ও টুকরা চাই।

যশোবন্ত বলল, আপনার এ কাজ আমি করে দিব এবং এ সকল যাবতীয় কাগজপত্র আমিই আপনাকে সংগ্রহ করে দিব। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, না, এ হতে পারে না যশোবন্ত বাবু! অফিসে যে কাজ এক রুটিনে চলে আসছে সেখানে আপনার অনুপ্রবেশ সংশয়ের জন্ম দিবে। আপনি শুধুমাত্র ঐ সকল সুইপারদের নাম আমাকে দিন। এটা সুইপারদের কাজ, এ কাজ আমরা তাদের থেকে নিব। তাছাড়া এ কাজের বিনিময়ও খুবই স্বল্প যা আপনার জন্য মানান সই নয়। মোটা অংক পেতে পারেন জেনারেল সাহেবের

সেলফে রাখা বড় ফাইল হস্তগত করে। কিন্তু তা সাধ্যাতীত। ক্ষণিক চুপ থাকার পর আমি যশোবন্তকে পরবর্তী ডাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে সে জানালো সামনে থেকে সে ডাক সপ্তাহে দুইদিন শনি ও মঙ্গলবার দিবে। অফিস থেকে ফেরার পথে তার গলির বাইরে দুধ-দইয়ের দোকানে ডাকের থলে আদান-প্রদান করা হবে। আর ডাক ফেরৎ দেবার জন্যে মঙ্গলবার রাত বারটায়। যখন সে পায়চারী করার জন্যে গলির বাইরে আসবে। আর শনিবার সুমির প্রাসাদ থেকে ফেরার পথে সাড়ে এগারটা থেকে বারটার মধ্যে রোডেই হবে। আমি বললাম, হয়তো আমি আসব না হয় আমার এক সাথী আসবে। যে বড় গোঁফ বিশিষ্ট চশমা পরিহিত থাকবে। তোমার কাছে এসে সিগারেট জ্বালানোর জন্য দিয়াশলাই চাইবে। তার কোড নম্বর হবে ডান। ডান শুনামাত্রই ডাকের থলে তার হাতে ধরিয়ে দিবে। এ সময় ডাকের প্যাকেট যশোবন্ত টেবিলের নিচে দিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি তা আমার পোশাকের নিচে লুকিয়ে ফেললাম। এই সকল বুঝিয়ে যখন আমি চেয়ার থেকে উঠতে যাব তখন যশোবন্ত কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল যে, জেনারেল সাহেবের ফাইলের বিনিময় কিরূপ হতে পারে? আমি বললাম, যশোবন্ত বাবু! যে কাজ আপনি করতে পারবেন না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ? আপনি যেহেতু বন্ধু মানুষ তাই বলছি, কমছে কম পঞ্চাশ হাজার টাকা তো হবেই। পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা শুনামাত্রই যশোবন্তের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। ১৯৭০ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকাকে অনেক কিছু মনে করা হতো। বর্তমানকালে যুব সমাজ তৎকালের পঞ্চাশ হাজার টাকার পরিমাণ এর দ্বারা করতে পারবে যে, পাকিস্তানে তখন নির্ভেজাল খাসির গোশত চার টাকা কেজি পাওয়া যেত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম বর্তমানকালের তুলনায় খুবই কম ছিল। ভারতে নির্মিত বস্তুর দাম তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের চেয়ে কম ছিল।

যশোবন্তকে ওখানে রেখেই আমি রেষ্টুরেন্টের বাইরে এলাম। আমার সাথীরা বাজারে ঘুরতে ঘুরতে এক দোকান থেকে স্কুল ড্রামারের মেকআপের জন্য বানানো কৃত্রিম গোঁফ ও শিখধাঁচের দাড়ি কিনে আনল। তারা এগুলো শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য ক্রয় করেছিল। কিন্তু সেগুলো কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। তার চুল এমনিতেই বড় ছিল। আমি তাকে শিখধাঁচে নির্মিত পাগড়িও ক্রয় করতে বললাম। এখন আমার চার সাথীর কাছে শিখ সেটআপের পরিপূর্ণ উপকরণ রয়েছে।

যশোবন্তের সাথে যোগাযোগের নিরাপদ ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ডাক আদান-প্রদান করার দায়িত্ব তাদের কাছে অর্পণ করতে চাই। কেননা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একই সময়ে কয়েক স্থানে ইনভলভ হয়ে পড়েছি। আর সময়ও আমার খুব কম। সিনেমা থেকে বের হয়েই আমি একটি অপটিকেলের দোকান থেকে হোয়াইট অটো গ্লাসের চারটি চশমা কিনে নিলাম। যশোবন্তের অবস্থাদৃষ্টে আমি একাকিই একটি পরিকল্পনা আঁটলাম। সোজা চাউড়ি বাজারে সুমির প্রাসাদে চলে গেলাম। প্রভাতের বানারস এবং বিকালের রোদের বাহারী সৌন্দর্যের ন্যায় নর্তকীদের প্রাসাদও সন্ধ্যার সাথে সাথেই বাহারী সাজের সমারোহে সুশেভিত হয়। এখনো বিকাল চারটা বাজেনি। আমি আমার আগমনের সংবাদ জানালাম। তখন মধ্যবয়সী এক গায়ক আমাকে অন্দরে নিয়ে গেল। রাতের সজ্জিত হলরুম সিগারেটের টুকরা, উপচেপড়া পিকদান, এলোমেলো বাদ্যযন্ত্র চন্দ্র লোকে সুশোভিত। আমি গায়ককে বললাম, সর্দারনীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। একটু পরেই আমাকে অন্দর মহলে পৌঁছে দেয়া হলো। সেখানে সুমি ও অন্য দুই তিন তরুণী একসাথে চিৎ হয়ে এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে আর এক পালংকে সর্দারনী হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তার জিজ্ঞাসু চাহনি অসময়ে আসার কারণ জানতে চাচ্ছে। আমি তাকে জানালাম যে, আমি সুমির ব্যাপারে কিছু কথা বলতে এসেছি। এতে তার জিজ্ঞাসার অবসান ঘটল না। আমি এক হাজার টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং সঠিক জবাব দাও। হাজার টাকায় আমার অসময়ে আসার অনুমতি তার চেহারা থেকে উধাও হয়ে গেল। সে গায়ককে গালি দিয়ে ডাকতে শুরু করল, এখনও আমার জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় আন নাই? ততক্ষণে সুমি ও অন্য মেয়েরা জেগে গেছে। সর্দারনী তাদেরকে ইশারা করলে তারা অন্য কামরায় চলে গেল। সমস্ত তরুণীদের মধ্যে শুধু সুমিই ক্ষুদ্রাকারের নোলক পরেছে। আমি সর্দারনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সুমির ব্যাপারে কোথাও কি কথা হয়েছে? জবাবে সর্দারনী না সূচক মাথা নাড়ল। আমি তার নজরানা জিজ্ঞাসা করলাম। সর্দারনী আমাকে খদ্দের মনে করে বলল, বিশ হাজার টাকা। এক পয়সাও কম হবে না। তারপর আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, এ ব্যাপারে যশোবন্ত বাবুর সাথে কখনো কথা হয়েছে কি? জবাবে সে জানালো, সে বৃদ্ধ তো আমার বালিকার জন্যে দেওয়ানা। এ পর্যন্ত আমার খুকির পদযুগলে কয়েক হাজার টাকা উৎসর্গ করেছে। কিন্তু আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি যে, যদি

বিশ হাজারের এক পয়সাও কম হয় তবে ভুলেও এ লক্ষ্যে সিঁড়ি মাড়াবে না। আহ্ পূর্বে কি জামানা ছিল। আমার মা বলতেন যে, এ প্রাসাদে বড় বড় ধনকুবের আদরের দুলালরাই পা বাড়াত। আর এখন তো কলিযুগ, যার পকেটে একশ' টাকা থাকে সেই নিঃসংকোচে অন্দরে চলে আসে। আমার খুকিদের মসৃণ পদযুগল নাচতে নাচতে অবশ হয়ে যায়। তবুও পাঁচ টাকার বেশি বিল দিতে চায় না। আমি বললাম, যদি কেউ সুমিকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দেয়। এ কথা শুনামাত্র সর্দারনী আনন্দে ফেটে পড়ল এবং আমাকে বলেই ফেলল যে, জহুরীই হিরার মূল্য জানে। সে আরও কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, যশোবন্ত আসলে এ কথা বলবে যে এক সর্দার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। আমি তার নিকট থেকে এক সপ্তাহের সময় চেয়েছি। আপনি যেহেতু আমাদের পুরাতন খদ্দের সে হিসাবে সর্বাগ্রে অধিকার আপনারই। ইতিপূর্বেও আপনি আমাদের বিশ হাজারের ডিমান্ডকে প্রত্যাখান করে নিজের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছেন। আপনি এবারের পঁয়ত্রিশ হাজারের ডিমান্ডকে সারভাবনা করতে করতে নষ্ট করে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করবেন না। সর্দারের দুলাল তো এরচেয়ে বেশি দিতে প্রস্তুত। কোন প্রকার কার্পণ্য করবে না। অতএব আপনাকে এক সপ্তাহের সময় দেয়া হল। অন্যথায় পরে আমাদের কাছে কোন প্রকার অভিযোগ করতে পারবেন না। এই প্রসঙ্গে ভুলেও আমার নাম বলবেন না। মোটকথা, সর্দারনীকে খুব ভাল করে পামপট্টি দিলাম। কিন্তু তাকে খুবই চৌকস মনে হল। সর্দারনী বলল, সর্দারজী! আপনার সব কথাই তো ষোল আনা ঠিক। তবে যশোবন্ত বাবু যদি পঁয়ত্রিশ হাজারে রাজি না হয় তবে আমরা কি বিশ হাজারে সম্মত হব? তখন আমি সর্দারনীর হাতে এক হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, যশোবন্ত বাবু যদি এক সপ্তাহের ভেতর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে না পারে তবে আমি বিশ হাজার টাকা এমনিতেই দিয়ে দিব। তবে শর্ত হল যে, আমার কথার উপর অক্ষরে অক্ষরে কাজ করতে হবে। এই বলে বিদ্যুৎগতিতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমার এই বাজি খেলায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যশোবন্ত সুমিকে পেতে জীবনবাজি রাখতেও প্রস্তুত হবে। পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে সেই ফাইল দুটো হস্তগত করা আমাদের সিনিয়রের জন্যে খুবই সস্তা হবে। কেননা ইতিপূর্বে এক গ্রুপ এ মিশনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই কাঙ্ক্ষিত তথ্য আমাকে উদ্ধার করতে হবে। চাউড়ী বাজার থেকে ফেরার পথে আমি

সাথীদের ঘরে গেলাম এবং ডাকের কপি প্রস্তুত করলাম। পুরাতন ডাকের কপিও সাথে নিয়ে সাথীদের বললাম, আজ হতে যশোবন্ত থেকে ডাক আদান-প্রদান ও ডাকের কপি বানানোর জিম্মাদারী তোমাদের উপর। এ কথা বলে শনি ও মঙ্গলবারের ডাক আদান-প্রদানের স্থান ও সময় তাদের জানিয়ে দিলাম। তারপর সাথীদের রবি ও বুধবারে সকাল দশটায় ডাকের কপি লুধি হোটেলের কাছেই মোগল মহল রেষ্টুরেন্টে আমার কাছে পৌছাতে বললাম। যশোবন্ত থেকে ডাক আদান-প্রদান করতে দুইজন সাথী যাবে। একজন গোঁফ বিশিষ্ট চশমাধারী থাকবে অন্যজন সিভিলভাবে তাকে কভার করবে। এ সময় আমরা সিনিয়রদের নির্দেশের পরিপন্থী একটি কাজ করলাম। আমি সাথীদের লুধি হোটেলে আমার অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দিলাম এবং প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বললাম। আমার এ ফয়সালা গ্রহণের নেপথ্যে ছিল তিনটি কারণ। প্রথমত তাদের বাসায় আমার বারবার যাতায়াত সমিচীন নয়। বাসার মালিক ও এলাকাবাসীর মাঝে সন্দেহের অংকুর জন্মাতে পারে। দ্বিতীয়ত আমার সাথীরা আমার সম্পর্কে কিছুই জানতো না। বিশেষ প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভবও নয়। তৃতীয়ত আল্লাহ না করুন, আমি যদি কোথাও কখনো গ্রেফতার হয়ে যাই তবে তারা যেন আমার সম্পর্কে অন্ধকারের মরুদ্যানেই ঘুরপাক না খায়। আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম। আমার গ্রেফতার হওয়ার পর যেন তারা নির্ধারিত কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

পরদিন সারা বেলা হোটেলেই কাটালাম। প্রেরিত ডাক প্রস্তুত করলাম এবং সকল কৃতকর্মের শুভ সংবাদ সম্বলিত বিস্তারিত রিপোর্ট কালো কালিতে লিখলাম। সহযোগীদের থেকে বিশ হাজার টাকা গ্রহণ ও যশোবন্তের জন্যে অধিক টাকার প্রয়োজনের কথাও লিখলাম। তারাপুরের মিশনের ব্যাপারে অব্যাহত প্রচেষ্টা ও আশাব্যঞ্জক সফলতার কথাও ব্যক্ত করলাম। সূর্যাস্তের পূর্বেই ডাকের প্যাকেট তৈরি করলাম। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমার তিন সাথীকে সাথে নিয়ে কনটাক্টর্স-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। এবারে আমার আবেদন অনুযায়ী দুইজন কন্টাক্টর্স পাঠানো হয়। তারা ডাকের বিশাল বড় থলে সাথে করে এনেছে। আমার সাথীরা আমাকে কভার দিচ্ছে। আমি কন্টাক্টর্স থেকে থলে নিয়েই আমার দ্বিতীয় সাথীর হাতে সোপর্দ করলাম। সে তা বাসায় নিয়ে যাবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, কন্টাক্টর্স-এর আমার সাথে কোন প্রকার কথা বলার অনুমতি নেই। যার ফলে সে আমার থেকে

ডাক নিয়ে তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশিষ্ট দুই সাথীকে নিয়ে তিনটি টেক্সি পরিবর্তন করে বিভিন্ন এলাকায় অনর্থক ঘুরে ফিরে সাথীদেরকে পথের বিভিন্ন স্থানে নামিয়ে দিয়ে আনুমানিক দুই ঘণ্টা পর তাদের ঘরে পৌছলাম। টেক্সি পরিবর্তন করা, বিভিন্ন এলাকায় অযথা ঘুরাফেরা করা এবং বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথকভাবে সাথীদেরকে নামানো আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এই সতর্কতা অবলম্বন এজন্য করা যে, যদি কেউ কন্টাক্টর্স-এর পিছু নিয়ে থাকে তবে সে যেন আমাদের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছতে না পারে। তাদেরকে পথের মধ্যেই যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেওয়া যায়। এবারের ডাক প্যাকেটে আমাদের জন্যে পারিবারিক পত্র ছাড়াও দুটি ক্যামেরা এবং প্রতি ক্যামেরার জন্যে বারটি করে ফিল্ম রিল এবং সাইলেন্সর সম্বলিত ত্রিশ বোরের একটি পিস্তল, অতিরিক্ত তিনটি ম্যাগাজিন ও দুইশ' গুলি এবং পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় রুপী আছে। সিনিয়রের পত্রে আমাদের কর্মতৎপরতার আশাতীত প্রশংসা করা হয়। যশোবন্ত থেকে অর্জিত ডাকের তীব্র প্রয়োজনীয়তাও ব্যক্ত করা হয়। প্রেরিত ক্যামেরা দুটির একটি সাইজে সিগারেট লাইটের মত। যার দ্বারা ডাকের ফটো ধারণ করা সম্ভব আর দ্বিতীয় ক্যামেরাটি হচ্ছে অটো যার মধ্যে বেল্ট ইন ফ্লাশ গিন আছে। সিনিয়রের একটি পত্র বিশেষ করে আমার কাছে লেখা। তাতে আমাকে বিভিন্ন নির্দেশনার সাথে এ কথাও লেখা ছিল– তোমাদের দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী অসম যোগ্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমরা যদিও জীবনের মায়া করো না ঠিক তবে তোমাদের জীবন আমাদের জন্যে বড়ই মূল্যবান। অতএব, খুব ভেবেচিন্তে সন্তর্পণে সামনে পা বাড়াবে। সাইলেন্সর লাগানো পিস্তল আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য উপহার। যদি প্রয়োজন পড়ে তবে তা অকুণ্ঠচিত্তে ব্যবহার করবে। আগামীতে প্রতি রবি ও বুধবার দুপুরের পর ঠিক দুইটায় আমরা ওয়্যারলেস মারফত তোমাদের সাথে কন্টাক্ট করব। যাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ছাড়াও তোমাদের সকলের ভাল-মন্দ জানা যায়। আর তুমি জবাবে শুধু ম্যাসেজ রিসিভ এবং অল ওকে বলবে।

আমার ধারণা মতে এই ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে যে, আমরা ট্রান্সমিটারযোগে লাহোরের সাথে যোগাযোগ করতে এবং সংবাদ প্রেরণে অধিক সময় ব্যয় করলে আমাদের ট্রেস হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। পক্ষান্তরে লাহোর থেকে ট্রান্সমিট হওয়া পয়গাম যত বেশি সময় লাগুক না কেন রিসিভকারীর সংক্ষিপ্ত জবাব প্রেরণে ধরা পড়ার ভয় অনেকাংশে কম। আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে যে, নতুন ব্যবস্থার কোথাও জানি গলদ আছে।

আমি এটাকে শুধুমাত্র আমার মনের দুর্বলতা মনে করে ভুলে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এর দুই তিন দিন পরই পত্রিকাতে হেড লাইনে প্রকাশিত এলাহাবাদে পাকিস্তানী মেজর গোয়েন্দা বন্দী হওয়া এবং তারপর তার তিন সাথীর ট্রান্সমিটার অধিক ব্যবহারের কারণে আগ্রাতে বন্দী হবার খবর আমার আশংকার সত্যতা প্রকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করে। কিন্তু বাস্তবে কি এরূপ সংবাদ প্রকাশ হয়েছে? না এমন কোন সংবাদই ছাপা হয়নি। কর্ণেল শংকরই তা সপ্তাহ দশদিন পর এক সাক্ষাতে বিস্তারিত জানালো যে, আহসান নামক এক পাকিস্তানী মেজর ৩৯ মাউন্টেন্ট ডিভিশনের উর্দি পরিধান করে কোন স্পেশাল ডিউটির ছলনা করে এলাহাবাদে দাঁড়িয়ে ছিল। সে মেসে অবস্থানকারী ভারতীয় এক কর্ণেলের পিছু লেগেছিল। মেসে কয়েকদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে কর্ণেলের মুসলমান বেটম্যানকে অর্থের বিনিময়ে বশে আনতে চায় এবং তাকে আশ্বস্ত করতে নিজেকে পাকিস্তানী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়। কর্ণেলের ডায়েরী এনে দেয়ার বিনিময়ে বেটম্যানকে সে মোটা অংকের টাকা প্রদানের কথা বলে এবং তার অর্ধেক অগ্রীম দিয়ে দেয়। আর এ বেটম্যান কিছু অধিক ভারতপ্রিয় ছিল। যার কারণে সে কর্ণেলকে জানিয়ে দেয়। বেটম্যানের বক্তব্য অনুসারে মেজর আহসানকে তখনই গ্রেফতার করা হয় এবং তার উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি নেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার স্বীকারোক্তি ব্যতীত তার মুখ থেকে আর কোন কথা বের করতে সক্ষম হয়নি যে, সে শুধু নিজের নাম ও র‍্যাংক নম্বর এবং পুনাতে স্টেশনড ৩৯ মাউন্টেন্ট ডিভিশনের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই, এটাই স্বীকার করে।

ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স তার মুখ থেকে তার সাথীদের নাম ও সহযোগীদের নাম বের করার অভিলাষে মেজরকে ব্রেফিং পয়েন্টে নেয়ার জন্য তার উপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালায় এবং তার উভয় পায়ের আঙ্গুল কর্তন করা হয়। হাত কাটা হয়, তারপর উভয় বাহু কর্তন করা হয়। কিন্তু এত সীমাহীন নির্যাতনের পরও মেজর আহসানের মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি। নির্যাতন ভোগ করতে করতে পরিশেষে একদিন শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে শহীদদের ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেন।

তার সাথী আগ্রাতে ছিল। মেজর আহসান যখন নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন পরও তাদের কাছে পৌঁছেনি তখন তারা দিশেহারা হয়ে যায় এবং বারবার লাহোরের সাথে ট্রান্সমিটারযোগে যোগাযোগ শুরু করে। এমতাবস্থায়

ট্রাসার তার সিগন্যাল কেস করে এবং স্থান নির্দিষ্ট করে। যার ফলে তারা তিনজনই ট্রান্সমিটারসহ গ্রেফতার হয়। কর্ণেল শংকর আমাকে যা জানায় আমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকি। আমি তাকে এমন কোন প্রশ্ন করিনি যা কর্ণেলকে আমার ব্যাপারে সন্দেহে ফেলতে পারে। এ সকল বিবরণ আমি ডাক মারফত লাহোর পাঠিয়ে দিলাম। অনেকদিন পর আমি জানতে পারলাম যে, মেজরের সহকারী তিনজনকেও অবর্ণনীয় নির্যাতন করে শহীদ করে দেয়া হয়। তথাপি তারা শাহাদাতকেই আলিঙ্গন করে। মুখ খুলে জাতীয় গাদ্দারে পরিণত হয়নি। তাই তাদের মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি। আল্লাহ তাদের শাহাদতকে কবুল করুন।

বন্ধুরা আমার, আপনারা হয়তো বা ভেবে থাকবেন যে পাকিস্তান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভারতীয় কারেন্সী আসার কারণে আমাদের অবাধে ব্যয় করার অনুমতি ছিল। না, কখনও না। বরং আমার হোটেল ভাড়া ও সাথীদের বাসা ভাড়া ছাড়া আমার জন্যে মাসিক চার হাজার টাকা ও সাথীদের জন্যে মাসিক চার হাজার টাকা ও সাথীদের প্রতি টাকার পাই পাই হিসাব রাখতে হত। মিশনের হিসাবের খাতায় ব্যয়ের বিস্তারিত রিপোর্ট জাষ্টিফিকেশনকে দিতে হত। সাথীদের ব্যয়ের খাতায় যেহেতু এডভান্স জমা ছিল এ কারণে এবার সাথীদের কোন টাকা দেয়া হয়নি। সহযোগীদের থেকে গ্রহণকৃত টাকা অবশিষ্ট এবং এইবার প্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা হোটেলে এনে রেখে দিলাম। এ সকল টাকা দেশ ও জাতির আমানত। আর আমরা যেহেতু নিজের জীবনকে জন্মভূমির জন্যে উৎসর্গ করেছি, সেহেতু এই আমানতে কোন প্রকার খিয়ানতের কল্পনাও করা যায় না। আমি সাথীদেরকে মেজর আহসান ও তার সাথীদের শাহাদতবরণের খবর জানিয়ে বললাম যে, এখন আমাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। আমি তাদেরকে কঠোর ভাষায় বললাম, কখনো একাকী বের হবে না এবং একে অপর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। যদি মনে হয় যে কেউ পিছু নিয়েছে তবে চালবাজি করে তাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবে। আর যদি চালবাজিতে ব্যর্থ হও এবং বাঁচার আর কোন পথ বাকী না থাকে তখন পিছু ধাওয়াকারীকে গুলি করে হত্যা করবে। সাথে সাথেই সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আমার উপদেশ শুনে সাথীরা জানাল সরায়ে বিরামখানে ঘোরাফেরা করার সময় তারা ছুরি চাকুর এক দোকান থেকে এমন পাঁচটি ছুরি ক্রয় করেছে যার প্রস্থ অর্ধ ইঞ্চির কিছু কম এবং এক ফিট লম্বা এবং হাতে ধরার

জন্যে মোটা বেত ছুরির হাতলে নির্মিত স্ক্রুপের সাহায্যে ফিট হয়ে যায়। তারা এমন একটি বেত আমাকেও দিয়েছে। ছুরি বাস্তবিকই খুব মজবুত ও তীক্ষ্ণ ধারলো ছিল। যার দ্বারা বিনা আওয়াজে শত্রুকে খতম করা যায়। পাকিস্তান থেকে প্রেরিত সাইলেন্সর বিশিষ্ট পিস্তল রাখার জন্যে এমন কভার ও এমন বেল্ট পাঠানো হয়েছে যার দ্বারা পিস্তল পোশাকের ভিতর পরিপূর্ণভাবে লুকানো যায়। আমি সাথীদেরকে দ্বিতীয়বারের মত সতর্ক করে দিয়ে বললাম, অস্ত্রের ব্যবহার একমাত্র কঠিন বিপদে পতিত হলেই করবে– অন্যথায় নয়। সাথীদেরকে মেজর আহসানের শাহাদাতের কথা জানানো এবং তাদের থেকে ছুরি গ্রহণ করার ঘটনা আমাদের বিগত কর্মতৎপরতার আনুমানিক বারদিন পরের। কেননা গত সোমবার আমরা পাকিস্তানী কনটাক্ট থেকে ডাক গ্রহণ করি ও ডাক প্রেরণ করি এবং পরদিন দুধ-দইয়ের দোকানে যশোবন্ত থেকে আমার সাথীদের ডাক নেওয়ার কথা ছিল। আমার সাথীরা মঙ্গলবার যশোবন্ত থেকে ডাক গ্রহণ করে এবং কপি বানিয়ে বুধবারে মোগল মহল রেষ্টুরেন্টে আমায় সোপর্দ করে। কপি ছাড়াও যশোবন্তের প্রদানকৃত একটি পত্রও আমাকে দিয়েছে। যার উপর মোস্ট আর্জেন্ট লেখা ছিল এবং পত্রে লেখা ছিল, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে নিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। বুধবার রাত আটটায় গুলচা সিনেমা হলের রেষ্টুরেন্টে আপনার অপেক্ষায় থাকব। আমি আমার দুই সাথীকে বললাম, রাত পৌনে আটটায় গুলচা সিনেমা হলের রেষ্টুরেন্টে পৃথক পৃথকভাবে বসবে এবং আমার সাথে যশোবন্তের সাক্ষৎকালে চৌকান্না থাকবে।

আমি এমনিতেই পনের মিনিট দেরি করে রেষ্টুরেন্টে গেলাম। পূর্ব থেকেই সেখানে বসা আমার সাথীদ্বয় আমাকে গ্রীন সিগন্যাল দিল। যশোবন্ত রেষ্টুরেন্টের এক কোণে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার চেহারায় চিন্তা ও পেরেশানীর ছাপ। আমি যখন তার নিকটে গেলাম তখন সে মাথা তুলল। আমাকে দেখে যেন তার আশার আলো ফুটে উঠল। তাই অকপটে বলে উঠল, আপনি অনেক বিলম্ব করে ফেলেছেন। আমি সেই কখন থেকে বসে আছি! জবাবে আমি বললাম, আমি মাত্র পনের মিনিট দেরি করেছি। আচ্ছা যাই হউক, এমন কি বিশেষ প্রয়োজন যার জন্যে এ আয়োজন। যশোবন্ত আমার সামনে করজোড় হাতে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বলল, জনাব! আমার মান-সম্মান জীবণ-মরণ এখন আপনার হাতে। প্রত্যুওরে আমি বললাম, যশোবন্ত বাবু! খুলে বলতো আসলে ব্যাপারটা কি? এখানে একটি কথা না

জানিয়ে পারছি না। তা হচ্ছে যে, যশোবন্তকে আমি অদ্যাবধি আমার হিন্দু নামও জানাইনি। তাই সে শুধু স্যার জনাব বলে সম্বোধন করছে। মূল বক্তব্য শুরু করার জন্যে সে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে বলতে শুরু করল– স্যার, আপনার কাছে তো এখন আর কোন বিষয়ই গোপন নেই। আপনি জানেন যে আমি সুমিকে ছাড়া থাকতে পারি না, সুমিহীন যশোবন্ত মূল্যহীন। গতকাল সুমির কাছে গেলে পরে সুমির মা আমাকে অন্যত্র ডেকে নিয়ে বলল যে, এক খদ্দের সুমিকে পঁয়ত্রিশ হাজারের বিনিময়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। জানি না সে সত্য বলেছে না মিথ্যে বলেছে। কিন্তু সে আমাকে মাত্র এক সপ্তাহের সময় দিয়ে বলেছে, তড়িঘড়ি টাকার ব্যবস্থা কর। অন্যথায় সুমি হাত ছাড়া হয়ে অন্যের কাছে চলে যাবে। এ বলে যশোবন্ত অশ্রুভেজা নয়নে আমার দিকে আশাবাদী চাহনীতে দেখতে থাকল। জবাবে আমি বললাম যে, যশোবন্ত বাবু! এ ব্যাপারে আমার কি করণীয় আছে? এটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে যশোবন্ত আরো অধিক কাকুতি মিনতি করে বলল যে, জনাব! আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে আমি প্রাণান্তকর চেষ্টা তদবীর করেও এ টাকার ব্যবস্থা করতে পারব না। একমাত্র আপনি আমার শেষ ভরসা। তাই আশার গুড়ে ছাই চাপা না দিয়ে, ভগবানের দিকে চেয়ে দয়া পরবশ হয়ে এ ভিখারীকে এ টাকা এডভান্স দিন। আমি আগামীতে এ এডভান্সের বিনিময়েই ডাক সরবরাহ করতে থাকব। আমি একটু বেপরোয়া হয়েই তাকে বললাম, সরবরাহকৃত ডাকের বেশির ভাগই আমরা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেই। আমি এ পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা আপনাকে দিয়েছি তা আপনার সরবরাকৃত ডাকের কয়েকগুণ বেশি। আপনার সাথে যেহেতু বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তাই এ ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রেখেছি। এখন আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দরকার, কিন্তু আমি আপনাকে এই সাধারণ ডাকের বিনিময়ে তা এডভান্স দিতে পারি না। আমাকেও অন্যের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান যে, তারাপুরের ফাইল দুটি আপনি যদি আমাকে দিতে পারেন তবেই আপনি এই টাকা পেতে পারেন। যশোবন্ত এক দীর্ঘশ্বাস টেনে হতাশকণ্ঠে জবাব দিয়ে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু ঐ ফাইল দুটি তো জেনারেল সাহেবের আলমারিতে রক্ষিত, আর আলমারির চাবিও জেনারেল সাহেবের কাছেই।

আমি তখনই এই নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে বললাম, যশোবন্ত বাবু! সমস্যাই সমাধানের দিগন্ত উন্মোচন করে। জেনারেলের নির্দেশে তার আলমারি আপনিই খুলেন ও বন্ধ করেন। আর আপনি এই সুবর্ণ সুযোগে চাবির ছাপ

সাবানের উপর নিয়ে নিতে পারেন। অতঃপর সেই ছাপ দিয়ে চাবি বানিয়ে নিতে পারেন। জেনারেল সাহেব অফিস থেকে চলে যাওয়ার পর সেই নকল চাবি দিয়ে অতি সহজেই আলমারি খুলে ফাইল দুটি বের করতে পারেন এবং অফিস থেকে ফেরার পথে তা সাথীদের হাওয়ালা করেন, তবে সেই রাতে ফাইলের সাথেই পয়ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন।

যশোবন্ত চিন্তার অথৈই সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গেল। তার এই নীরবতা একমাত্র ভয়ের কারণে ছিল। যার ফলে তাকে চিন্তার সুযোগ না দিয়ে বললাম যে, চাবির ছাপ উঠাতে বেশির বেশি এক মিনিট লাগবে আর আলমারি থেকে ফাইল বের করতেও বড় জোর এক মিনিটই লাগবে। রিস্ক তো আপনি পূর্ব থেকেই নিয়ে আসছেন। আর এখানে তো মাত্র দু'মিনিটের ব্যাপার, যার বিনিময়ে পূর্ণ হতে পারে সে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। অন্যথায় এই আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি বুকে চেপেই আপনার মৃত্যু ঘটে তবে আপনার আফসোস বাড়বে বিনে কমবে না। মৃত্যুবরণ করেও আপনার আত্মা শান্তি পাবে না। যশোবন্তের ভয় তো কিছু দূর করেছি আর কিছু দূর করেছে তার মনের অভিলাষ। ক্ষাণিক ভেবেচিন্তে যশোবন্ত বলল, স্যার! জীবনে যেহেতু কোন আনন্দই নেই তখন এই রঙহীন সাদা জীবনকে আনন্দের রঙে সাজাতে এই রিস্কও নিব। দেশীয় সাবানের টুকরা আমি আজই সংগ্রহ করব, আর দেশীয় সাবান নরম হওয়ায় তার উপর ছাপ ভালভাবে তোলা যাবে। আলমারি খোলা ও বন্ধ করার সময় আমার পিঠ জেনারেল সাহেবের দিকে থাকে। এ কারণেই ছাপও খুব সহজেই নিতে পারব। জেনারেল সাহেব যেহেতু টাইপিংয়ের জন্য আমাকেই ডাকেন, এই সুবাদে তার চলে যাওয়ার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পূর্বে কোন এক বাহানায় তার কামরায় যেতে পারব এবং ফাইল বের করতে পারব। এতে কারো মনে কোন সন্দেহ জাগবে না। কিন্তু সমস্যা হল একটি যে, এ সময়ে জেনারেল যদি আমাকে না ডাকেন তবে কি হবে? এ সময় দ্বারা যশোবন্তের উদ্দেশ্য হল সুমির মা কর্তৃক প্রদানকৃত সুযোগ। আমি বললাম যে, এই নির্ধারিত মুহূর্তে জেনারেল যদি তোমাকে না ডাকে। তবে তাকে তোমার কলম ভুলে আলমারিতে রয়ে গেছে এ কথা বলে জেনারেল সাহেব থেকে চাবি নিয়ে নিবে। যদি ভালবাসা সত্য হয়ে থাকে তবে স্বয়ং ভগবানই পথ বের করে দিবেন।

যশোবন্ত এই বলে আমাকে নমস্কার করল যে, আপনি টাকা প্রস্তুত রাখবেন। আমি ফাইল দুটি নেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব। তারপর আমার থেকে বিদায় চাইল। আমি ভাবতে ছিলাম যে, যশোবন্তের ভগবান চাই তার

পথ বের করুক না করুক, আমার আল্লাহ অবশ্যই আমাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাবেন। হঠাৎ একটি কথা পরিকল্পনার দিগন্তে উঁকি মারল। তাই আমি যশোবন্তকে বললাম, যেহেতু তোমার ইমারজেন্সী দরকার সেহেতু আমার এক সাথী অফিস থেকে তোমার ফেরার পথে দুধ-দইয়ের দোকানে তোমার অপেক্ষা করবে। কেননা, ডাক উসুলের জন্যে তো মঙ্গল ও শনিবার নির্দিষ্ট ছিল।

যশোবন্ত দ্বিতীয়বারের মত আমাকে নমস্কার করে চলে গেল। ক্ষাণিক পর আমিও কল্পনা জগতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সফলতার দুলাচলে দুলতে দুলতে আনমনে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। সাথীদের বাসায় গিয়ে সাথীদের বললাম, আগামীকাল থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিদিন দু'জন করে যশোবন্তের ফেরার পথে দুধ-দইয়ের দোকানে যশোবন্তের অপেক্ষা করবে। এর মাঝে সাধারণ ডাক ছাড়া সে যা কিছু দিবে তা নিয়ে তখনই টেলিফোন করে আমাকে জানাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে মোগল মহল রেষ্টুরেন্টে এসে আমাকে দিয়ে দিবে। আমি আমার পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনার ষোল আনাই পরিপূর্ণ করে ফেললাম। এখন শুধুমাত্র যশোবন্তের সফলতার শুভ সংবাদ শোনার অধীর আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগলাম। আমার দুই সাথী প্রতিদিন যশোবন্তের ফেরার পথে দুধ-দইয়ের দোকানে উপস্থিত থাকে এবং নিজের উপস্থিতির কথা অনুধাবনও করায়। এভাবেই কেটে গেল কয়েকদিন। এরই মাঝে পূর্বনির্ধারিত দিনে যশোবন্ত তাদেরকে পত্রের খাম দিল এবং সেই ডাকে হেড কোয়ার্টারের পত্রাদি ছাড়াও তিন সুইপারের নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল এবং প্রত্যেকের নামের সাথে এটাও লেখা ছিল যে সে কোন সিনিয়র অফিসারের রুম পরিষ্কার করে। এবার আমরা যশোবন্তের প্রদানকৃত ডাকের আলোকে ছবি তুলে নিলাম এবং কপি করার শ্লেটে কপি করে নিলাম। কেননা, ফিল্ম রিল তো পাকিস্তান গিয়েই ডেভেলপ হবে। আর তখন এর রেজাল্ট জানা যাবে। কপিগুলো আমরা অতিরিক্ত সতর্কতামূলক করেছি। এই আশা ভরসার অপেক্ষার কোন একদিন আব্দুল করিম আমার হোটেলে আসল এবং তার ধারণা মতে কর্ণেল সম্পর্কে চার পৃষ্ঠার একটি লেখা দিয়ে চলে গেল।

আব্দুল করিম তো সহীহ-শুদ্ধ পরিষ্কার উর্দু বলে বটে কিন্তু তার লেখা অতি সাধারণ। কর্ণেল শংকর সম্পর্কে সে যা কিছু লিখেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এতদসত্ত্বেও সে হচ্ছে কোমল হৃদয়ের অধিকারী। এপেন্ডিক্সের

অপারেশনের জন্যে আব্দুল করিমকে যখন সি,এম,এইচ-এ ভর্তি করানো হয় তখন কর্ণেল শুধু তার শুশ্রূষাই করেনি বরং প্রতিদিন তার জন্যে ফলফ্রুটও নিয়ে যেত। আব্দুল করিমের লেখা একটি বিষয় আমাকে সচেতন করে দিল যে, কর্ণেল শংকর কখনো কখনো মাতালাবস্থায় ভারত তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত গালমন্দ করে থাকে এবং বলে যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের আনাড়ী আচরণের কারণে পাক-ভারত একে অপরকে চিরশত্রুতে পরিণত করেছে। আব্দুল করিমের কথামত কর্ণেল উপলব্ধি করত যে, ভারত পূর্ব-পাকিস্তানকে তো বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু এখন ভারতের টুকরো টুকরো হওয়ার পালা। আর ভারতের এই পরিণতি এভাবেই হবে যে, ভবিষ্যতে পাক-ভারতের যে যুদ্ধ হবে তা হবে এটমি যুদ্ধ। এটমি যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে উভয় দেশে যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে। তা পাকিস্তানী মুসলমানরা তো নত শিরে মেনে নিবে। পক্ষান্তরে ভারতীয় হিন্দুরা তা কখনো মেনে নিবে না এবং যুদ্ধের পরপরই ভারতীয় হিন্দুরা বিশাল ভারত সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করে ফেলবে। তখন তাদের কাছে যুদ্ধ করার মত এমন কোন শক্তি ও উপায় উপাত্ত থাকবে না যার দ্বারা যুদ্ধের কল্পনা করতে পারে। আব্দুল করিমের কথানুযায়ী কর্ণেল শংকর মাথা ঠুকে বলত-- এই ভয়াবহ পরিণতি অবশ্যই হবে, তবে তা হবে ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ার পর। হায় আফসোস! ভারতের বিভক্তি যদি যুদ্ধের পূর্বেই হত তবে এক বিশাল ভয়ানক ধ্বংসলীলা ও বরবাদী থেকে রক্ষা পেত।

কর্ণেল শংকরের ধারণা মতে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশ তখন পাকিস্তানের সহযোগী হবে। পক্ষান্তরে ভারত তখন এক ঘরে হয়ে যাবে। আব্দুল করিম লিখেছে যে, রাতের বেলা মাতালাবস্থায় শংকর যাই বকে সকাল বেলা তা আবার আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, আমার কথা অন্য কেউ তো শুনেনি? আমার থেকে আশ্বস্ত হওয়ার পর আমাকে দশ পনের টাকা দিয়ে বলে বড়ি বানাও, ভারতীয় মুসলমানদেরকে আশুযুদ্ধে অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। এখন থেকে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

কর্ণেল শংকর সম্পর্কিত আব্দুল করিমের লেখাকে আমি কয়েকবার পড়লাম এবং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম। পরিশেষে রেজাল্ট বের করলাম যে, আব্দুল করিমের দৃষ্টিতে আমি একজন ভারতীয় হিন্দু ও কর্ণেল শংকরের বন্ধু। সে যা কিছু লিখেছে তা ঠিকই লিখেছে। আব্দুল করিম যদি

ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত যে আমি একজন পাকিস্তানী, কর্ণেল শংকরের শত্রু তবে সে প্রথমে আমার মন জয় করা এবং তার ক্ষতিসাধন করার জন্যে আমাকে ভুল তথ্য সরবরাহ করত। আর এই ভুল তথ্য সম্বলিত লেখায় তারও অপূরণীয় ক্ষতি হত। অতএব সর্বদিক বিবেচনা করে এ তথ্য সঠিক মনে করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কর্ণেল শংকর স্বয়ং নিজেই কোন এক গোধূলী বেলায় কথা প্রসঙ্গে বলেছিল যে, '৬৫ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে তার সহযোদ্ধারা অনুসন্ধান চালিয়ে আমাদের সুপার হাইওয়ে গোলা, 'রানী এবং শিরনীর' সঠিক সন্ধান পেয়ে যায়। আর এই তথ্য তারা কর্ণেল শংকরকে জানায়। কিন্তু কর্ণেল শংকর এই লোভনীয় তথ্য পাচার না করে সেই গোলাকে ভারতীয় কামান ও বোমারু বিমানের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করেছিল। কর্ণেল শংকরের কথোপকথন, লাহোরের সাথে তার হৃদয় সঞ্জিভূত এবং স্বীয় সহপাঠী ক্লাস ফলোর প্রেমে ব্যর্থতা, মানসিক বিপর্যস্ততা, অদ্যাবধি কুমার থাকা এসব কিছু ভেবেচিন্তে ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আব্দুল করিমের লেখাকে আমি সঠিক মনে করলাম। আমি কর্ণেল শংকরের ব্যাপারে যে চিত্র অংকন করলাম তা হচ্ছে, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের একগুয়েমীকে ভুল প্রতিপন্নকারী এবং মুসলমানদের জন্য উদারমনা এমন এক ব্যক্তি, যে অপারগতাবশত ভারতের সেনাবাহিনীতে চাকরি করছে এবং সময় সুযোগে ভারতের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে উগ্র হিন্দুদের মোকাবেলা করার জন্য এবং সম্ভাব্য পাক-ভারতের যুদ্ধে পাকিস্তান সহযোগী ও কল্যাণকামী, এসকল দিকগুলোকে সামনে রেখে আমি কর্ণেল শংকরের অধিক নিকটবর্তী হয়ে তাকে অধিক যাচাই-বাছাই করে তার কাছ থেকে অগণিত উপকারী তথ্য হস্তগত করা যাবে। কর্ণেল শংকরকে নিজের ওয়েটিং লিস্টের সর্বাগ্রে রাখলাম। কিন্তু যতক্ষণ না যশোবন্তের ব্যাপার শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ অন্য কোন ইস্যুতে হাত বাড়াতে রাজি নই। যশোবন্তের প্রদানকৃত সুইপারদের নাম ঠিকানা আমি ঐ দুই সাথীর কাছে অর্পণ করলাম যারা পূর্ব থেকেই হেড কোয়ার্টারের সুইপারদের পিছে লেগে আছে। এখন তাদের কাজ হলো এই তিন সুইপারকে হ্যান্ডেল করা।

সুমির মার প্রদানকৃত অবকাশের সময় এখনো বাকি আছে। আর আমি এ অবকাশের সময়সীমা বৃদ্ধিও করতে পারি। যশোবন্তকে আলমারীর চাবি হস্তগত করতে এবং কাঙ্ক্ষিত ফাইল বের করতে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা আমার সামনে স্পষ্ট। কিন্তু আমার ও আমার সাথীদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যশোবন্তের সফলতা কামনা

করে তার অফিস থেকে ফেরার পথে বসে থাকতাম। কিন্তু বিকাল বেলা সকল আশা-ভরসার অবসান করে যশোবন্ত যখন চুপ করে নত শিরে বাড়ির দিকে চলে যেত তখন আমরাও সকলে নিরাশ হয়ে যেতাম। এই অবস্থার অবতারণা মূলত তারাপুরের এটমি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই হয়েছিল। কখনো কখনো আমার আশংকা হত যে, যশোবন্ত না জানি সমূহ বিপদের ভয়ে ভীত-বিহ্বল হয়ে কাজ হতে হাত গুটিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় এ কাজ উদ্ধার করার জন্যে আমাদের কাছে রক্ষিত জরির সাথে তোলা ছবি এবং হেড কোয়ার্টারের ডাক ফেরত দেওয়ার সময়ে ফাইল কভার যার উপর ক্লাসিফাইড এন্ড কনফারডেনশন ছাপা এ ছবিই যথেষ্ট। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে, যশোবন্তের এ কাজ স্বীয় গরজে অভিলাষ পূরণের জন্যে করুক। যখন সুমির মার বেঁধে দেওয়া সময়সীমার আর মাত্র একদিন বাকি তখন যশোবন্ত অফিসিয়াল ডাকের সাথে একটি চিঠি দিল– যা আমার সাথীরা তখনই আমার কাছে পৌছে দেয়। পত্রে যশোবন্ত আজকেই গুলচা সিনেমার রেষ্টুরেন্টে সাক্ষাৎ করতে বলেছে। সময়ও নিজের পক্ষ থেকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

নির্দিষ্ট সময় আমি রেস্টুরেন্টে পৌছে গেলাম। তখন যশোবন্তের অবস্থা বর্ণনাতীত ছিল। তার চেহারায় নিরাশা এবং ব্যর্থতার কালো মেঘ ছেয়ে আছে। সে বলল, জেনারেল কয়েকদিন যাবৎ অফিসেই আসছে না। সে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। যার চারদিন অতিবাহিত হয়েছে। ছুটির পূর্বের দিন জেনারেল আমাকে ডাকেনি বা জেনারেলের কামরায় প্রবেশ করার মত কোন সুযোগও আমি পাইনি। কেননা, আমি যখনই জেনারেলের কামরার দিকে গিয়েছি তখনই দেখেছি যে, সেখানে মিটিং হচ্ছে। যশোবন্ত নিজের ব্যর্থতায় একদম আশাহত হয়ে বলতে থাকল, এখন সুমিকে পাওয়ার আশা অলীক হয়ে গেছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, জেনারেলের ছুটি শেষে পুনরায় সুযোগ পাওয়া যাবে। তখন যশোবন্ত অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁদ কাঁদস্বরে বলে উঠল, সুযোগ তো পাব ঠিকই। তবে সে সুযোগ যে কোন কাজে আসবে না। কেননা, সুমির মার দেয়া সময়সীমা আগামীকালই শেষ হয়ে যাবে। এটা এমন এক সময় যে আমাকে যশোবন্তের ভগ্নহৃদয়ের আশাহত হিম্মতকে পুনরায় আন্দোলিত করতে হবে।

আমি যশোবন্তকে বললাম– বাবু হে! মনকে কখনো ছোট করো না। সুমিকে নিশ্চিত তুমিই পাবে। সুমি তোমারই হবে। তখন বিকাল সাতটা বাজে। আমি যশোবন্তকে এক হাজার টাকা দিয়ে বললাম যে, তুমি বাসায়

যাও এবং ফ্রেশ হয়ে নয়টায় সুমির বালাখানায় যাবে। আমিও সেখানে সুমির মাকে তার বেঁধে দেয়া সময়সীমা দীর্ঘায়িত করতে সুপারিশ করব। যশোবন্ত এবং আমি একত্রেই রেষ্টুরেন্ট থেকে বাইরে এলাম। সে তার বাসায় চলে গেল আর আমি টেক্সি নিয়ে সুমির প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলাম। আমি মূলত আসর জমার পূর্বেই সুমির মাকে ব্রিফ করতে চাচ্ছিলাম। আসর সাজানোর প্রস্তুতি চলছে। আমি সুমির মার সাথে এক স্থানে একাকী কথা বললাম যে, আজ রাত নয়টায় যশোবন্ত এবং আমি উভয়ে একত্রে তোমার কাছে আসব। তখন যশোবন্তের জন্য বেঁধে দেওয়া সময়সীমা দীর্ঘায়িত করতে অস্বীকৃতি জানাবে। আমি বারবার অনুরোধ করার পর তার পক্ষ হতে পাঁচ হাজার টাকা এডভান্স দিলে পরেই তাকে অতিরিক্ত দশ দিন সময় দিবে। এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

নয়টা নাগাদ প্রস্তুতি গ্রহণ করে টাকা পয়সা নিয়ে চাউড়ী বাজারে সুমির প্রাসাদের কাছাকাছি চলে এলাম। যশোবন্ত সেখানকার এক পান দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলতে লাগল যে, আমি তো সেই সাড়ে আটটায়ই এখানে পৌঁছে গেছি এবং পানের দোকানেই দোকানদার থেকে গ্লাস এবং সোডা নিয়ে নিজের মোড বানাচ্ছি। আমরা উভয়েই একত্রে সুমির প্রাসাদে প্রবেশ করলাম।

আসর শুরু হয়ে গেছে। আমি ইঙ্গিতে সুমির মাকে পিছনের কামরায় যেতে বললাম। সে পিছনের কামরায় আসার সাথে সাথে আমরাও কামরায় চলে গেলাম। আমি যশোবন্তকে বললাম যে, যা বলার আছে তড়িঘড়ি করে বলে ফেল। যশোবন্ত সময়সীমা দীর্ঘায়িত করতে বলল। তখন সুমির মা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে বলল যে, জনাব! আমি তো পরিষ্কার বলে দিয়েছি, এই বাজারের চারদিকে শুধু সুমি, সুমি এক রব উঠেছে। সুমিকে বাগে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সুমিকে স্বপ্নে দেখতে হলে পকেট গরম থাকতে হবে। আমি তো যশোবন্ত বাবুকে শুধুমাত্র পুরাতন গ্রাহক হওয়ার কারণেই বলে দিয়েছি। অন্যথায় সেও অন্যদের মত শুধু দাওয়াতনামাই পেত। এখন আমি অতি শীঘ্রই সুমির অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। কাস্টমার তো পূর্ব থেকেই অধীর আগ্রহে আমার ইশারার অপেক্ষায় আছে।

যশোবন্ত কাতরকণ্ঠে মিনতি করে সময় বৃদ্ধির আবেদন করে ডুকরে কেঁদে ফেলল। এ সকল আচরণে সর্দারনীর হৃদয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন হয়নি। সে সামান্যও হেলেনি। আমি যখন অনুভব করলাম যে যশোবন্ত

একদম নিরাশ হতে চলেছে তখন সুমির মাকে বললাম, আপনি কখনো ভাববেন না যে, যশোবন্ত বাবুর কাছে টাকা নেই। সে টাকা অন্যত্র রেখে দিয়েছে। যেখান থেকে টাকা উসুল করতে বিলম্ব হচ্ছে। এখন শুধুমাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। আপনি আপনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন– এ কথা বলে পাঁচ হাজার টাকা সুমির মায়ের হাতে গুঁজে দিলাম। এই নিন! পাঁচ হাজার টাকা অগ্রীম। আজ থেকে দশ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন। অনুষ্ঠানের পূর্বেই বাকী টাকা পেয়ে যাবেন। সর্দারনী এই পাঁচ হাজার টাকা তখনই লুফে নিয়ে বলল, বাকি ত্রিশ হাজার তো সুমির নজরানা। এ ত্রিশ হাজার থেকে তো অনুষ্ঠান হবে না। তাছাড়া বাজারের সকল প্রাসাদবাসীকেই দাওয়াত কর'তে হবে। আর আমরা এমন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সকল গ্রাহককেও দাওয়াত করে থাকি। রাত অব্দি বাজারের সকল তরুণী নৃত্য পরিবেশন করবে এবং সুমির জন্য এক সেট জামাও বানাতে হবে। আর যশোবন্ত বাবুকে সুমির হৃদয়গ্রাহী চেহারা দেখার জন্য ১২ তোলার সেটও প্রদান করতে হবে। এ যাবতীয় খরচাদি যশোবন্ত বাবুকেই বহন করতে হবে।

আমার জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সুমির মা জানাল যে, সর্বমোট দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। তখন তাকে বললাম যে, সেই দশ হাজারও ত্রিশ হাজারের সাথেই পেয়ে যাবেন। আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকুন। সমস্ত কথা শেষ করে আমরা কামরা থেকে বের হয়ে হল রুমে এলাম। আসর এখনো পুরোদমে জমে উঠেনি। যশোবন্ত অতিশয় আনন্দে গদ গদ করতে থাকল। সুমির মা আমাকে বসার জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু আমি বিশেষ কাজের আপত্তি তুলে ওজর পেশ করলাম। পক্ষান্তরে যশোবন্ত নিজেকে হবু বর ভেবে মৌজের সাথে আসরে বসে গেল। তার পকেটে আমার প্রদানকৃত এক হাজার টাকা কিলবিল করছিল। আমি যশোবন্তের সাথে চলতে চলতে বললাম, আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় গোলচা সিনেমার রেষ্টুরেন্টে আমার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে, কেমন?

পরদিন সন্ধ্যা বেলায়ই যশোবন্তকে গোলচা সিনেমার কাছেই ঘুরঘুর করতে দেখলাম। আমি তাকে রেষ্টুরেন্টে যাওয়ার জন্যে ইংগিত করলাম। আমিও রেষ্টুরেন্টে ঐ টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমি কথা বলার পূর্বেই যশোবন্ত আমার অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। বলল যে, গত রাতে আমি কথা বলে মৃতপ্রায় স্বপ্নকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি। আমি তাকে বললাম, যশোবন্ত বাবু! আমার করণীয় যা ছিল তা করেছি। এখন আপনার

পালা। আপনাকে দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হবে। এ কাজে আপনাকে দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিতে হবে। যে পাঁচ হাজার টাকা আমি সুমির মাকে দিয়েছি এর চেয়ে বেশি কিছু আমার করার নেই। যে কোনভাবে হউক আপনাকে সেই ফাইল দুটি এনে দিতে হবে। সুমির মা অতিরিক্ত আরও দশ হাজার টাকা আদায় করার ফন্দি আঁটছে। আমি সেই দশ হাজারও পরিশোধ করব। তবে এজন্যে আপনাকে যৎসামান্য অধিক পরিশ্রম করতে হবে। জেনারেলের আলমারিতে শুধুমাত্র এ ফাইল দুটিই নয়, বরং এছাড়া আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল থেকে থাকবে। জেনারেলের অফিসিয়াল ডাইরীও সেই আলমারিতে রক্ষিত আছে। আপনাকে তারাপুরের ফাইল দুটির সাথে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ফাইলও আমাকে এনে দিতে হবে। কেননা, ফাইলে সংরক্ষিত কাগজপত্র আপনিই টাইপ করে থাকেন। বর্তমান জেনারেলের পূর্বে যে জেনারেল দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সে জেনারেলের অফিসিয়াল ডাইরীও আলমারিতে আছে। কেননা, এমন ডাইরী অন্যত্র পোস্টিংয়ের সময় জেনারেলরা সাথে নিয়ে যায় না। বরং পরবর্তী জেনারেলের সহযোগিতার জন্যে সেই ডাইরী এখানেই রেখে যায়। আপনি বর্তমান জেনারেল ও তার পূর্বের তিন জেনারেলের ডাইরীসমূহ ফাইলের সাথে আনতে ভুল করবেন না। যশোবন্ত আমার কথাগুলো তন্ময় হয়ে মনযোগের সাথে শুনছিল। আমি বলতে থাকলাম, যশোবন্ত বাবু! আপনি যে পথে পা বাড়িয়েছেন পথে প্রতিটি মুহূর্তে আপনাদের অর্থের প্রয়োজন পড়বে। সুমিকে শুধুমাত্র আপনার করে রাখার জন্যে প্রতি মাসে তাকে দিতে হবে টাকার নির্দিষ্ট একটি এমাউন্ড। তারপর সুমির দাবি দাওয়া পূরণ করতে গিয়ে আপনাকে বিশেষ একটি এমাউন্ট ব্যয় করতে হবে। আমাদের চাহিদা মাফিক যদি আপনার সহযোগিতা পাই তবে আপনাকে আর অর্থের চিন্তা করতে হবে না। একথা বলার সময় যশোবন্ত পলকহীনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি যখন চুপ হলাম তখন সে ক্ষাণিক চুপ থেকে বলল, স্যার! এখনো পর্যন্ত আপনার নামটিই জানা হল না। কখনো আপনি বলেননি আর আমি জিজ্ঞাসা করার সাহসও পাইনি। কিন্তু সুমির প্রাসাদে কাকতালীয়ভাবে আপনার সাক্ষাৎ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি পর্যন্ত অবস্থার আলোকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনি কোন না কোন রাষ্ট্রের জন্যে কাজ করছেন। আপনার সঙ্গ দিতে গিয়ে আমি নিজে কণ্ঠনালী অব্দি ডুবে গেছি। এখন আমার আর পিছু হটার কোন পথ বাকী নেই বরং আপনার সহযোগিতা করাতেই আমার জীবন নিহীত আছে। আমার বিরুদ্ধে

আপনার কাছে যে সকল প্রমাণাদি আছে তার মাধ্যমে আপনি আমাকে জীবন্ত প্রোথিত করতে পারেন এবং ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলাতে পারেন। তাছাড়া আমার লোকেরা গুলি করে আপনার লীলাসাঙ্গ করতে পারে। এই বলে তার কথা শেষ করলাম।

আপনি একদম ঠিক বলেছেন। এখন আমি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমার সন্তানাদিরা আমার চিরশত্রু, তারা বাসায় এমন পরিস্থিতির অবতারণা করেছে যে, এখন আমার বাসা থেকে মন উঠে গেছে। তার প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে। কখনো কখনো ভাবি যে, এমন কোন দূর দেশে নির্জন এলাকায় চলে যাব যেখানে আমাকে কেউ চিনবে না। আমার সারা জনম অফিসিয়াল কাজেই অতিবাহিত হল। ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। সন্তানের প্রতি এক বুক আশা নিয়ে অকাতরে টাকা ব্যয় করেছি যে, সে বৃদ্ধকালে আমার লাঠি হবে। আর এখন সে-ই আমাকে বাসা থেকে বিতাড়িত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ইতিপূর্বে আমার কামরাটিই ছিল বাসার মধ্যে সবচেয়ে খোলামেলা ও মুক্ত বাতাসে শীতল। কিন্তু এখন কর্ণারের বদ্ধ কুঠুরীই হচ্ছে আমার অবকাশস্থল। আমাকে কোন কিছু না জানিয়েই আমার ব্যক্তিগত সহায় সম্বল এ একটি খাট সেই বদ্ধ কুঠুরীতে ফেলে দেয়া হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও দৈবাত যদি কখনো দেরি হয়ে যায় তবে পক্বকেশধারী এ অসহায়কেই পাত্র থেকে হীম শীতল খাবার নিয়ে গলধঃকরণ করে জীবন বাঁচাতে হয়। আমার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনদের কারোর আমার সাথে বাসায় সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেই। নিজ ঘরেই প্রবাসী হয়ে আছি। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বন্দি জীবন থেকে মুক্তির আশায়, দুঃখ-যাতনা লাঘব করার জন্যে আমি নেশা করি আর সুমির প্রমোদখানার দিকে পা বাড়াই। যদিও কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী উর্বসী প্রাণোচ্ছল তরুণীর তপ্তশ্বাস ও হৃদয়মোহিনী হাসি ও মদ আমাকে প্রশান্তি ও অনাবিল আনন্দ দিয়ে দুঃখ-যাতনা লাঘব করেছে। কিন্তু এই আনন্দের নাগাল পেতে তো অর্থের প্রয়োজন। উদার মনে সে প্রয়োজন আপনি পূরণ করেছেন। আপনি আমার সহযোগিতার আশাতীত বিনিময় আদায় করেছেন। আপনার কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। আজ আমি এমন এক গুপ্তধনের সন্ধান দিতে চাচ্ছি যে, জেনারেলের আলমারিতে এমন ড্রয়ার রয়েছে যা কিনা অন্য একটি চাবি দ্বারা খুলতে হয়। আমি কোন একদিন জেনারেলকে সেই ড্রয়ারে বিভিন্ন কালারে চিহ্ন সম্বলিত ও রেখা যুক্ত একটি নকশা ও অন্যান্য কাগজপত্র রাখতে দেখেছি। জেনারেল

সমেবাত্র মিটিং সেরে উঠেছেন। তখন আমাকে টাইপ করতে ডাকা হয়। অতঃপর আমি যা কিছু টাইপ করেছি তারপর তা কপি করে প্রধানমন্ত্রীর অরনিওয়াল এবং এয়ার চিফ হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং টাইপকৃত মূল কাগজ জেনারেল নকশার সাথেই রেখে দিয়েছে। টাইপ করতে গিয়ে আমি জানতে পেরেছি যে, এটা পাকিস্তানে আক্রমণ করার বিস্তর প্লান। সেই নকশা ও কাগজপত্র আজও আলমারিতে সংরক্ষিত আছে। তা আপনার হাতে তুলে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আপনি এই কাজের যথাযোগ্য বিনিময় প্রদান করে আমাকে তুষ্ট করবেন।

যশোবন্ত আজই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সাথে আমার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছে। আমি বিস্মিত হলাম যে, সে এ কথা ইতিপূর্বে কেন বলেনি। অথচ এ কথা বলার সুযোগ তো বহুবার এসেছে। যখন সে এ কথা বলতে পারত, হয়তো বা আমার হুমকি ধামকি ও সশস্ত্র সাথীদের গুলির ভয়ে এ কথা বলার দুঃসাহস করেনি। কিন্তু আজ শেষ অবধি হৃদয়ে চেপে থাকা সেই কথাটি মুখ ফুটে বলে ফেলল। আমি তাকে বললাম, যশোবন্ত বাবু! আমার মনে হয় এটাই শ্রেয় যে, আমরা সব কিছু জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কখনো মুখ খুলিনি, ভবিষ্যতেও খুলব না। তবে তোমাকে এতটুকু জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমাকে আর্থিক সহযোগিতা করা ছাড়াও তোমার জীবনের নিরাপত্তা আমরা নিজ কাঁধে নিয়েছি। তুমি যদি কখনো কোন মসিবতে পতিত হও তবে তোমার জীবন বাঁচাতে যদি ডজন লোকের জীবন হনন করতে হয় তথাপিও তোমার জীবন বাঁচাতে আমরা পিছ পা হব না। যুদ্ধের প্লান ও যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রের এমন বিনিময় প্রদান করব যা তোমার কল্পনাতীত। তবে তা এক শর্তে, যদি তা আমার কাজে আসে।

দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর আমি রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। এ পর্যন্ত কাজগুলো নিয়মিত চলছিল। এখন মাত্র যশোবন্তের পক্ষ থেকে সফলতার সু-সংবাদের অপেক্ষার পালা। তাই আমার প্রতিটি মুহূর্ত এ সংবাদ শ্রবণের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠার মাঝে কাটতে লাগল। এই সাক্ষাতের পর যশোবন্ত আমার সাথীদের কাছে নির্দিষ্ট দিনে ডাকের প্যাকেট দুইবার প্রদান করল। যাকে আমরা নিয়ম মাফিক ফটোকপি বানিয়ে ফেললাম। আমার খুব ভাল করে মনে আছে যে. শনিবার দিন বিকাল বেলা। আর বাইরে বইছে হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীত। তাই আমি আমার কামরার সোফাতে আধো শোয়া অবস্থায় পত্রিকা পড়ছি। বিকাল চারটার দিকে টেলিফোন সেট ক্রিং ক্রিং

বেজে উঠল। অপর প্রান্ত থেকে আমার এক সাথী বলতে ছিল। আনন্দের তীব্রতায় তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছিল না। খুব কষ্টের পর তার মুখ থেকে রা বের হলো– স্যার! ডাক পেয়ে গেছি! তার কথার আওয়াজে অনুভব করতে সক্ষম হলাম যে, যশোবন্ত যুদ্ধ জয় করেছে। আমি সাথীকে বললাম যে, এখনই বাসায় পৌছে যাও। আমি সেখানে আসছি। আনন্দের প্রলয়ংকরী ঝড়ে আমারও অবস্থা বেহাল হয়ে গেছে। তাই আমি তড়িঘড়ি কাপড় পরিবর্তন করে টেক্সি নিয়ে সাথীদের বাসার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। সারা পথে এই কল্পনাই করতেছিলাম যে, মহামহিমের অশেষ কৃপায় আমাদের পথ খুলে যাচ্ছে এবং জটিল থেকে জটিল কাজ আমাদের জন্য সহজতর হয়ে যাচ্ছে। এ আকাশ-কুসুম সফলতার একমাত্র কারণ তার অপার দয়া ও করুণা।

সাথীদের বাসায় যাওয়ার পর তারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ডাকের থলে আমার সামনে উল্টিয়ে দিল। আমার চোখের সামনে কার্পেটের উপর তারাপুর এটমি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত দুটি ফাইল, চারটি ডায়রী, যার কভারের উপর লাল ব্যাজ ও চার তারকা খচিত রয়েছে। তাছাড়া ভিন্ন একটি প্যাকেট থেকে বের করা কাগজপত্র ও নকশা এবং সাধারণ ডাকের প্যাকেট পড়ে আছে। বর্ণনাতীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার আমার পদতলে পতিত রয়েছে। এসবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহ যে, এত স্বল্প সময়ে নামেমাত্র চেষ্টা তদবিরের বিনিময়ে কোন জীবনের ক্ষতি ব্যতিরেকে এ বিশাল সফলতা লাভ করা গেছে। আমাদের পাঁচজনের কেউই পেশাদার গোয়েন্দা বা পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলাম না। আমরা শত্রুদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল ঘাঁটিতে নিশছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যূহ ভেদ করে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মুখোশই উন্মোচন করিনি বরং শত্রুদের রণকৌশলের প্লানও হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে বিধাতার দরবারে লুটিয়ে পড়লাম। তারপর ভাণ্ডারে তল্লাশি অভিযান শুরু করলাম।

## ১ম খণ্ড সমাপ্ত

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৮৭৬২৮৬৭৮